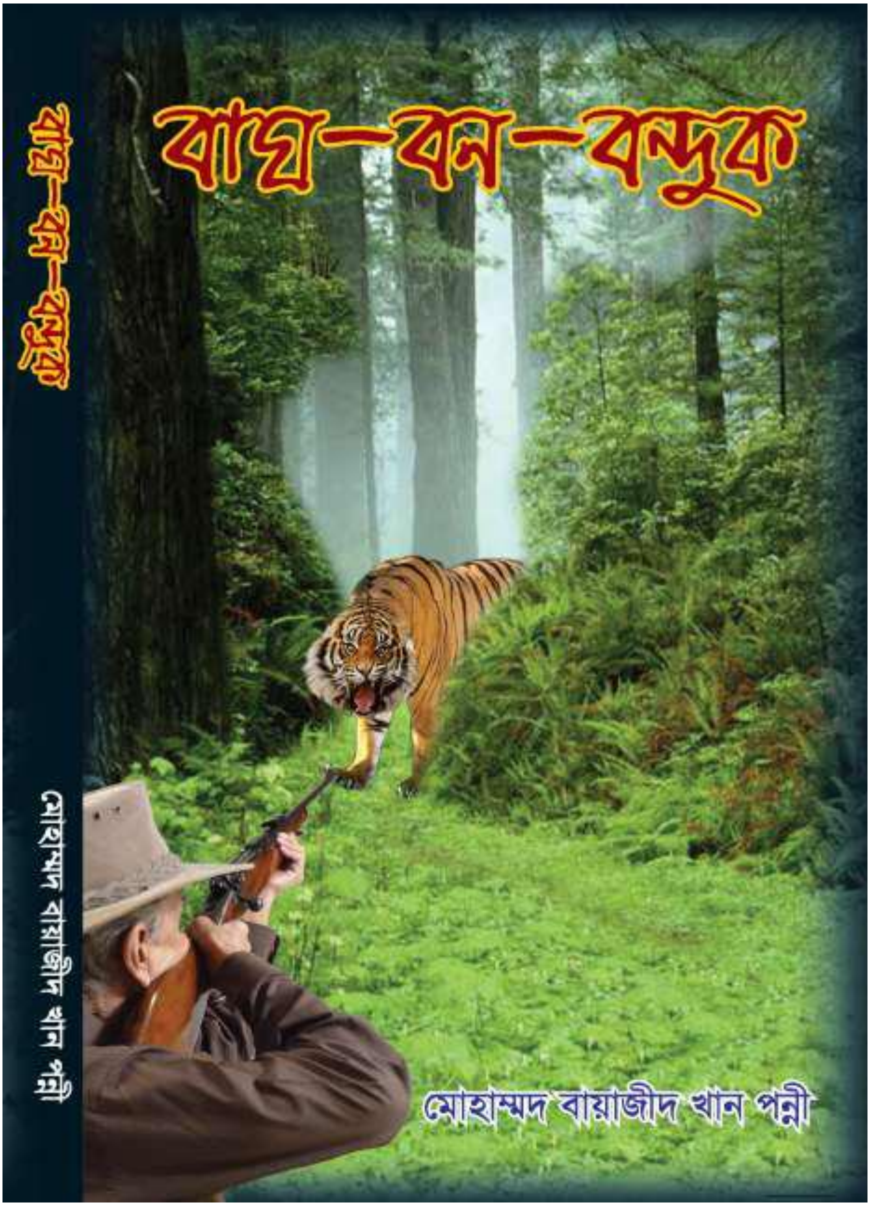
বাঘ–বন–বন্দুক
মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

বাঘ-বন-বন্দুক পড়ে বড়ই প্রীত হয়েছি। শিকার কাহিনী বাংলায় খুব কমই রচিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে হয়নি বললেই চলে।...এর মধ্যে অকস্মাৎ বাঘ-বন-বন্দুক এক উপেক্ষিত এবং অনাস্বাদিত জগতের যাবতীয় রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠাকে এমন সরসরূপে উপস্থিত করেছে যে পঞ্চমুখে আমি তার তারিফ করতে কুণ্ঠিত নই।...আমি বিশেষ করে মনে করি এই বই আমাদের দশম কি দ্বাদশ শ্রেণীর দ্রুতপাঠের গ্রন্থরূপে গৃহিত হওয়া উচিত।

মুনীর চৌধুরী
সম্পাদক, পূর্বাঞ্চল শাখা,
পাকিস্তান লেখক সংঘ।

..বাঘ-বন-বন্দুক নামটির মধ্যে যে রোমাঞ্চ ও রহস্য ১৯৬৪ সাল নাগাদ প্রকাশিত এই বইখানার মধ্যেও তার আভাস বিদ্যমান। ...তাঁর শিকার কাহিনী পড়তে ভালো লাগে, আবার পড়ার পর ভাবনার খোরাকও যোগায়। এটি শিক্ষামূলক গ্রন্থও বটে। ...ভিন্ন স্বাদের এই রচনা সংযোজনে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আনোয়ারা বেগম
প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও প্রধান, বাংলা বিভাগ,
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
১লা বৈশাখ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

..বায়জিদ খান পন্নী পেশাদার লেখক নন, সখের শিকারী। শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বইখানি লেখা। সাহিত্যিক হবার দাবীও তাঁর নেই। তথাপি তার বইখানি যে সুলিখিত, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।...শিকারের নেশা যাঁদের আছে, তারা বইখানি আরো বেশী উপভোগ করবেন, সে সম্পর্কে আমার দ"ঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

সৈয়দ আবদুল মান্নান
১৭-৭-১৯৬৪

REVIEW OF BOOKS

...Mr. Panni writes with an acute awareness with jungle sights and sounds, his words are charged with a great love and also for birds and animals. With its veracity of experience, its ease and modesty of narrative, and not the least, its intensive excitement and suspense, this book remains outstanding among hunters' records.

Z.A

১৯২৫ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়ায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত পন্নী বংশীয় জমিদার পরিবারে লেখকের জন্ম। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন শাসক ছিলেন লেখকের পূর্বপুরুষগণ। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব দাউদ খান পন্নী মোঘল সেনাপতির হাতে নিহত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের দু'শ পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা সূর্য্য কয়েক শতাব্দীর জন্য অস্তমিত হয় এবং দিল্লীর প্রদেশরূপে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল সুবেদারদের দ্বারা শাসিত হোতে থাকে। এর পর পলাশীর যুদ্ধের পরিণতিতে এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের হস্তগত হয়।

লেখক গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষে প্রথমে সা'দত কলেজ এবং পরে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী এদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা থেকে স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। শিকারের নেশা তাঁর রক্তে মিশে আছে। বালক বয়সে দাদা মোহাম্মদ হায়দর আলী খান পন্নী ও বাবা মোহাম্মদ মাহদী আলী খান পন্নীর কাছে তাঁর শিকারের হাতেখড়ি। সেই থেকে সত্তর দশকের গোড়া পর্যন্ত- দেশের বিভিন্ন পাহাড়ে ও বিলুপ্তপ্রায় বনে-জঙ্গলে ঘুরে শিকার কোরেছেন। শিকারের পাশাপাশি বালক বয়স থেকেই তিনি একটি প্রশ্নের জবাব নিরন্তর খুঁজে ফিরেছেন। তা হোল, একদা যে মোসলেম জাতি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিল সে জাতির আজ এ করুণ দুর্দশার কারণ কি? পরিণত বয়সে মহান আল্লাহ তাঁকে এ প্রশ্নের জবাব দান করেন। তিনি পৃথিবীর মানুষের সামনে এ জবাব পেশ করার জন্য উদগ্রীব হোয়ে ওঠেন; ফলশ্রুতিতে তাঁর সতেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু বই লিখেই তিনি ক্ষান্ত- হন না। প্রকৃত এসলামকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে তিনি 'হেযবুত তওহীদ' আন্দোলনের সূচনা করেন। বর্তমানে হেযবুত তওহীদের এমাম হিসাবেই তিনি সর্বমহলে পরিচিত।

ইংরেজীতে অসংখ্য শিকার কাহিনী রচিত হোলেও বাংলাদেশে শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা সম্ভবত এটিই প্রথম এবং একমাত্র বই। ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে স্বনামখ্যাত প্রকাশন 'মুক্তধারা' বইটি প্রথম প্রকাশ করে এবং পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবি মুনির চৌধুরী, সৈয়দ আব্দুল মান্নান, অধ্যাপিকা আনোয়ারা খাতুনসহ আরো অনেক বরেণ্য লেখক ও ব্যক্তিবর্গ বইটি সম্পর্কে তাদের সপ্রশংস অভিমত ব্যক্ত কোরেন।

বাঘ-বন-বন্দুক বইটিতে লেখক তাঁর নিজ প্রজন্মের এমন একটি অপ্রকাশিত দিক উন্মোচন কোরেছেন, যে দিকটি নব প্রজন্মের পাঠকদের কাছে নতুন এবং একেবারেই অনাস্বাদিত। অর্দ্ধশতাব্দি আগেও বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল গভীর বনভূমি। অনেক সখের শিকারীই তখন এসব বনে চিতা, হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, শুকর ইত্যাদি বন্যপ্রাণী শিকার কোরতেন। হিংস্র পশুর সাথে জীবন বাজি রেখে ভয়কে জয় করার মধ্যে যারা আনন্দ খুঁজে পান যৌবনে তাদেরই একজন ছিলেন লেখক। নগরায়নের হিংস্র থাবার শিকার সেই ভয়ঙ্কর বন আজ ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় খুঁজছে। এখন নতুন প্রজন্মের কাছে সেই সুবিশাল অরণ্যের কথা কেবল অবিশ্বাস্যই নয় কল্পনাতীত।

বিপদ্জনক শিকার পন্নী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য- তাই ছোট বেলা থেকেই লেখক বন্দুক হাতে বন জঙ্গলে শিকার কোরে বেড়িয়েছেন। এ বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে লেখকের সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কিছু অংশ। শিকারের উপকরণ ও আয়োজন, অরণ্যের সৌন্দর্য্য ও রহস্য, জন্তুর ভাষা ও আচরণ, বন্দুকের ব্যবহার ও প্রকরণ, শিকারীর শিক্ষা ও সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক এ বইয়ে আকর্ষণীয় তথ্য পরিবেশন কোরেছেন। শিকার কাহিনীর শিহরণমূলক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ না করেও তিনি বাঘ, বন, বন্দুক ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সত্য উদ্ঘাটন কোরেছেন। পাশাপাশি শিকারীদের সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে তার অসারতাও প্রমাণ কোরেছেন। আশা করা যায় অর্দ্ধশতাব্দির ব্যবধানে এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত সময়ে হোলেও বইটির পুনরাবির্ভাবে পাঠকবর্গ রোমাঞ্চিত হবেন।

বাঘ-বন-বন্দুক

(শিকারী জীবনের সত্য ঘটনা নিয়ে)

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তওহীদ প্রকাশন

বাঘ-বন-বন্দুক

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : কাজী আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ
কম্পিউটার কম্পোজ : মোঃ মসীহ উর রহমান
আলোকচিত্র সংগ্রহ : হাফিজুর রহমান
মুদ্রণ : ডন কমিউনিকেশন এন্ড প্রিন্টিং প্রাঃ লিঃ
৩৯-ক, বিজয়নগর, ঢাকা।
বাঁধাই : জননী বুক বাইন্ডিং, ১০৩, আরামবাগ, ঢাকা।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় : মোঃ রিয়াদুল হাসান
সর্বস্বত্ব : লেখক

প্রাপ্তিস্থান
পপুলার পাবলিশার্স, ২০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
উত্তরা বুকস্ এ্যান্ড স্টেশনারী, রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স, উত্তরা, ঢাকা।
সাবেরিয়া বুক হাউজ, ৩৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, সুমন সুপার মার্কেট, ঢাকা।
এবং দেশের সকল সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানসমূহ।

মূল্যঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র

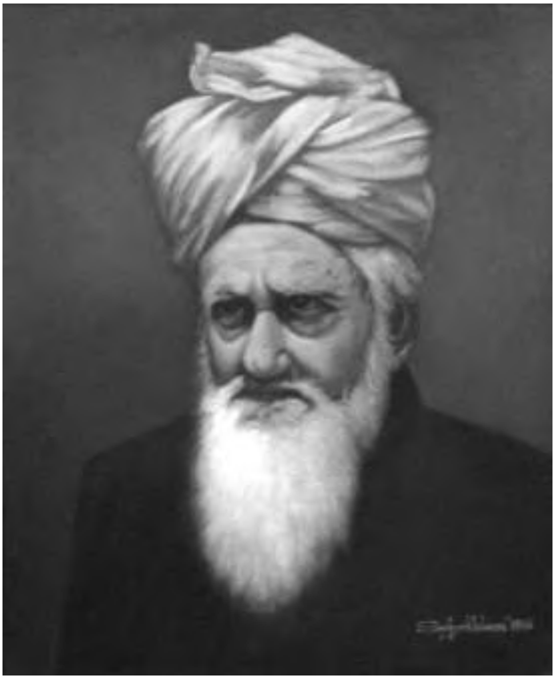

আমার দাদা মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নী

উৎসর্গ

বইটা যখন লিখেছিলাম তখন দাদা বেঁচে ছিলেন। তাই পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলাম যে বইটা তাঁকেই উৎসর্গ করলাম, কিন্তু বাঘ-বন-বন্দুক যখন ছাপা হ'ল তখন দাদা এ প্রত্যক্ষ পৃথিবী থেকে পরদা করেছেন।

তবুও যাঁর স্থির অবিচলিত সাহসের তুলনা আমি কোথাও দেখিনি, যাঁর কোলে মাথা রেখে ছেলেবেলায় শিকারের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতাম, সেই দাদা মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নীর উদ্দেশ্যে এই বই উৎসর্গ করলাম।

শুধু দুঃখ এই যে বাঘ-বন-বন্দুক তাঁর পবিত্র পায়ে রেখে দিতে পারলাম না।

লেখক-১৯৬৯

লেখকের কথা

(প্রথম প্রকাশ)

বাঘ-বন-বন্দুক যে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখল তার অধিকাংশ কৃতিত্বই প্রাপ্য বন্ধুবর সু-সাহিত্যিক জহুরুল আলমের। তার অক্লান্ত আর ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া এ বই কিছুতেই বের হত না, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই--কারণ আমার সময় হত না।

পাণ্ডুলিপিটা পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছেন আমার গ্রামের সা'দাত কলেজের অনেক ছাত্র-বন্ধুরা। তাদের নিঃস্বার্থ সহানুভূতি না পেলে এ কাজটাও আমার একার সাধ্য হত না।

বইটার নাম কি হবে, এ দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছেন আমার চাচাত ভাই জনাব নঈম খান পন্নী।

এদের কাউকেই ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

ইতস্ততঃ অধ্যায়ে লিখেছি, "ছোট বেলায় একটা হাতেলেখা পত্রিকায় একটা গল্প দেয়া ছাড়া জীবনে কিছুই লিখিনি, ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশিত হওয়া তো দূরের কথা।" তবুও সাহস করে বাঘ-বন-বন্দুক লিখে ফেলেছিলাম এবং বন্ধুবর জনাব জহুরুল আলমের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তা প্রকাশিতও হয়ে গিয়েছিল। এ বই যে এত সুনাম কুড়াবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত গুণীজনদের করা বিভিন্ন সাময়িক প্রত্রিকা ও রেডিওতে বাঘ-বন-বন্দুকের অজস্র প্রশংসা এবং পাঠকদের মধ্যে এর সমাদর আমাকে অবাক করে ফেলেছিল। Pakistan Writers Guild এর পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) লেখক সংঘের সম্পাদক স্বনামখ্যাত শহীদ মুনির চৌধুরী সাহেবের বাঘ-বন-বন্দুক বইয়ের সমালোচনা আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে দিয়েছিল। এ যেন প্রথমবার রায়ফেল হাতে নিয়েই বিশ্ব অলিম্পিকে শ্যুটিং-এ স্বর্ণপদক জয় করার মত। বিশেষ করে যখন বেগম সুফিয়া কামালের স্বামী শ্রদ্ধেয় কামাল সাহেব, যিনি মুনির চৌধুরীর ঘনিষ্ঠজন ছিলেন, তিনি আমাকে বললেন যে, 'মুনিরের হাত থেকে কোন বইয়ের এমন প্রশংসা আমি কখনও দেখিনি,' তখন আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানা কারণে বইটির পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়নি। এতদিন পর বাঘ-বন-বন্দুকের পুনঃপ্রকাশের জন্য আমি আমার স্ত্রী খাদীজা এবং আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র সেলিম, মসীহ, মাহফুজ, হাফিজ, মোহাম্মদ আলী, রিয়াদ–এদের জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ এদের সবাইকে তাঁর জান্নাতে স্থান দিন।

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

১ জানুয়ারী, ২০০৯

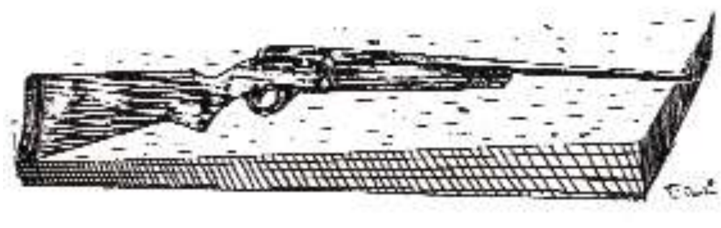

Burdwan House
Dacca-2

Regional Centres:
LAHORE
Guild House
Montgomery Road
Phone: 66244
Gram: PAKGUILD
DACCA
Burdwan House
Phone: 6552
Gram: PAKGUILD
KARACHI
Strachan Road
Phone: 55554
Gram: PAKGUILD

Literary Organs:
LITERARY PAKISTAN (English Quarterly)
HAMQALAM (Urdu Monthly)
PAKISTAN (Bengali Monthly)

Guild's own Publishing House operating at:
LAHORE
DACCA
KARACHI

Languages represented:
URDU
BENGALI
PUNJABI
SINDHI
POSHTU
GUJRATI
ENGLISH

Pakistan Writers' Guild

(East Pakistan Region)
Phone: 6552 Gram: PAKGUILD

বাঘ-বন-বন্দুক, [illegible], ঢাকা, [illegible], ১৯৬৪
প্রকাশিকা, [illegible], ৩২নং নবদ্বীপ বসাক লেন
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১

বাঘ-বন-বন্দুক পড়ে খুবই খুশী হয়েছি। শিকার-কাহিনী বাংলায় খুব কমই মুদ্রিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে হয়নি বললেই চলে। [illegible] কবিতা উপন্যাসের [illegible] [illegible] এর মধ্যে [illegible] বাঘ-বন-বন্দুক এক [illegible] ও উৎকণ্ঠাকে এমন নতুন রূপে উপস্থিত করেছে যে [illegible] আমি তার তারিফ করতে কুণ্ঠিত নই।

লেখক যে প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম হলেই বইটি প্রশংসার যোগ্য তা নয়। বইটি সুলিখিত। লেখক নিজে পাকা শিকারী এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী। [illegible] শিকারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে সক্ষম। শিকারের উপকরণ ও আয়োজন, অরণ্যের সৌন্দর্য ও ভয়ালতা, জন্তুর ভাষা ও আচরণ, বন্দুকের ব্যবহার ও প্রকরণ, শিকারীর শিক্ষা ও সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করেছেন। শিকার কাহিনীর [illegible] শিহরণমূলক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ না করেও বাঘ বন বন্দুক ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য [illegible] উদ্ঘাটিত করেছেন।

এই বই [illegible] বয়সের পাঠক পড়ে আনন্দ পাবেন। তরুণ বা কিশোরদের এ [illegible] হবে। আমি [illegible] মনে করি এই বই আমাদের [illegible] [illegible] শ্রেণীর স্কুলগুলোর [illegible] উচিত। [illegible] হবে, ছেলেমেয়েরা [illegible] পড়বে। তাই নয়, অনেক নতুন কথা শিখবে এবং একটা চারিত্রিক ক্রিয়াময় কর্মের অনুকূলে নিজের মনকে গঠন করে নিতে পারবে।

[illegible signature]

সম্পাদক, পূর্বাঞ্চল শাখা,
পাকিস্তান লেখক সংঘ।

বইটি সম্পর্কে শহীদ বুদ্ধিজীবি মুনির চৌধুরীর অভিমত

সূচিপত্র

১. ইতস্ততঃ..১১
২. কেন..১৪
৩. গোড়ার কথা...১৮
৪. ব্যতিক্রম..২৬
৫. ক্যামোফ্লেজ..৪০
৬. সাদা আর সবুজ..৪২
৭. সংস্কারের জন্ম...৫০
৮. ক্যাম্পফায়ার..৫৪
৯. মান্দাই...৫৯
১০. ধাঁধা..৭০
১১. গর্তের শিক্ষা..৭৮
১২. অনুসরণ..৮৪
১৩. দু'টো ঝাল...৯২

লেখকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী অন্যান্য বই

- ✓ এ ইসলাম ইসলামই নয়
- ✓ এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- ✓ এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- ✓ দাজ্জাল? ইহুদী খৃষ্টান 'সভ্যতা'!

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

এক
ইতস্ততঃ

অনেক দিন থেকেই বন্ধু-বান্ধবরা বলছিল, 'তুমি তোমার শিকারের ঘটনাগুলো গল্পের আকারে লেখনা কেন?' গা' করিনি। কারণ ছিল; প্রথমতঃ আমার শিকার জীবন এমন কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল নয়, হাতী গণ্ডার কিছুই মারিনি। দ্বিতীয়তঃ চিন্তা করার ছিল পড়বে কে?

শিকারের গল্পের দু'টো দিক আছে। একটা Technical, কারণ সমস্ত জিনিসটাই অত্যন্ত Technical, আরেকটি দিক হচ্ছে শুধু গল্প। প্রথম দিকটা পড়বার লোকের অভাব এ দেশে নিশ্চয়ই আছে। আর দ্বিতীয় দিকটাকে পড়ার মত করে লিখতে গেলে সেটাকে অন্ততঃ কিছুটা সাহিত্য হতেই হবে। ছোট বেলায় একটা হাতেলেখা পত্রিকায় একটা গল্প দেয়া ছাড়া জীবনে কিছুই লিখিনি, ছাপার অক্ষরে কিছু প্রকাশিত হওয়া তো দূরের কথা। একই হাতে রায়ফেল আর কলম সমান দক্ষতার সাথে ধরতে জীম করবেট ছাড়া কাউকে তো দেখিনি। কিন্তু সে ভাষাই বা আমি পাব কোথায়?

তারপর মাস কয়েক পর হঠাৎ রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে একটা অনুরোধ এল। "The Call of the Wild" নামে ইংরেজীতে একটা Series প্রচারিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। বিভিন্ন শিকারীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ছোট ছোট কথিকা ওরা প্রচার করছেন। আমাকে বলতে হবে আমার অভিজ্ঞতা। আমার ঘাড়ে পড়ল বন্য শুয়োর শিকারের গল্প। প্রথমে ভাবলাম- বাঘ নয় ভাল্লুক নয়, শুয়োর নিয়ে কি আর ভাল গল্প হবে। কিন্তু লিখে দেখলাম, মন্দ হয়নি তো। অন্য ঘটনাগুলো নিয়ে তো

তাহলে গল্প মন্দ হবে না মনে হচ্ছে। যাই হোক রেডিওতে বললাম, এবং সবার বেশ পছন্দও হ'ল। ইংরেজীতে লেখা এই কথিকাটা রেকর্ড হয়ে চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলি থেকে প্রচারিত হবার জন্য।

এইবার প্রথম ভাল করে ভাবলাম লেখার কথা। কিন্তু কাদের জন্য লিখব এই প্রশ্নটাই বারে বারে মনে আসছিল। একটা প্যান প্যানে কবিতার বই বা একটা সামাজিক উপন্যাস অথবা নিদেনপক্ষে একটা রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ হলেও কথা ছিল। কিন্তু বন্দুক, গুলী আর রক্তারক্তিভরা এ বই আমার জাতির কাছে পেশ করা যে বৈষ্ণবের হাতে নরবলির খাড়া তুলে দেওয়া! না, দোষ দিচ্ছি না। দু'শো বছর যে নিপীড়ন চলেছে তা যে কোন জাতকেই এমনি মেরুদণ্ডহীন করে দিতে পারে। মনে আছে ছোট বেলায় বন্দুকের ক্যাটালগগুলোয় .২২ বোরের Air gun অর্থাৎ পাম্প করে হাওয়া ভরা খেলনা বন্দুক-পিস্তলগুলোর নিচে লেখা থাকত No licence required except in Bangal অর্থাৎ বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও এগুলোর জন্য লাইসেন্স দরকার নেই। একদিক দিয়ে খানিকটা অহঙ্কার করা যেতে পারে এ নিয়ে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো লেখা হয়েছিল তা যে ব্যর্থ হয়নি তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাতটা সম্পূর্ণ নির্বীর্য হয়ে গেছে।

যাই হোক সেইসব ভাবনা-চিন্তার পরিণতিই হ'ল এই বই।

শিকার সম্বন্ধে আমাদের নিস্পৃহ হবার আরেকটা কারণ আছে। পৃথিবীর যত রকম Sports আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এই শিকার। কঠিন কষ্টসহিষ্ণু শরীর, লোহার মত স্নায়ু, সাহস, সজাগ চোখ আর কান, বুদ্ধি আর অসীম ধৈর্য্য এর সব কয়টি দরকার পড়ে শিকারে। একসাথে এতগুলি গুণের প্রয়োজন আর কোন Sports-এ হয় বলে আমার মনে হয় না। অথচ সে অনুপাতে এর নাম কম। একটা বিশেষ Group-এর লোক ছাড়া বাইরে একটা ভাল শিকারীর আদর নেই।

ব্যাপারটাকে আধুনিক গায়ক আর ওস্তাদের সঙ্গে তুলনা দেয়া যায়। গলাটা একটু ভাল হলে দু'চারটা গান রেকর্ড করেই অনেকে নাম কিনে ফেলতে পারে। আবার কেউ হয়ত পনের-বিশ বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অক্লান্ত সাধনা করে সত্যিকার গুণী হ'ল কিন্তু একটা বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতার বাইরে তার নামই কেউ জানল না। তাই একটা ভাল ক্রিকেট বা ফুটবল খেলোয়াড় একটা ভাল শিকারীর চেয়ে অনেক প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর আরও অনেক ব্যাপারের মত এটা অযৌক্তিক কিন্তু স্বাভাবিক।

কিন্তু এর একটা ক্ষতিপূরণও আছে। জলসায় হালকা গান গেয়ে প্রচুর হাততালিতে গায়ক যে আনন্দ পান, গভীর রাতে নির্জনে একা বসে নিখুঁত করে একটা দরবারী গেয়ে একজন ওস্তাদ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম তৃপ্তি পান না। তেমনি নিজের ভয়কে নিজে জয় করে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাঘ বা লেপার্ড বা হাতীকে মেরে আনার যে স্বাদ তাই বা শিকারী অন্যকে দেবে কি করে।

দু'টো কথা আগে থেকেই বলে রাখছি। এডভেঞ্চারের গল্প আর অতিরঞ্জন এ দু'টোর বন্ধুত্ব খুব বেশী। বহু কাহিনী আর ঘটনায় আমার তাই অভিজ্ঞতা। সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ মারার রোমাঞ্চকর কাহিনী নায়কের মুখে নিজ কানে শুনে সুন্দরবনে গিয়ে খোঁজ করে দেখেছি, একদম ডাহা মিথ্যা। ইউরোপিয়ান শিকারীদেরও অনেক বই পড়ে দেখেছি তারাও এ থেকে মুক্ত নন। তাই আমি বলে রাখছি--এ বইয়ে একটি শব্দও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নেই--আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে। আমার বন্ধু-বান্ধব এবং যারা আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন তাদের জন্য এটা বলছি না, যারা নন তাদের জন্যই বলা।

দ্বিতীয়তঃ প্রথমে ভেবেছিলাম বইটা ছাপতে দেবার আগে কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে দিয়ে ভাষাটা খানিকটা দোরস্ত করিয়ে নেব। কিন্তু তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা কথা। শরৎচন্দ্র কি দরকারে একটা ফটো তুলেছিলেন। ফটোটা খুব ভাল হয়নি, তাই একজন প্রস্তাব করলেন ফটোটা টাচ্ করিয়ে নেওয়া হোক যাতে চেহারাটা একটু ভাল দেখায়। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'ছবির চেহারা যদি আমার চেহারা থেকে ভাল দেখায় তবে তো ছবি আর শরৎচন্দ্রের রইল না, অন্য কারোর হ'ল।'

তাই আর কাউকে দিয়ে ভাষা ঠিক করলাম না। এর দোষ-গুণ, ভুল-ক্রুটি সবই নিছক আমার।

দুই

কেন

ইংরেজীর Big game শব্দটার বাংলা প্রতিশব্দ নেই। যেসব জানোয়ার শিকার করতে নিজেরও জীবনের আশংকা থাকে, তাকেই মোটামুটি Big game বলতে পারি। মানুষের সৃষ্টির প্রথম থেকে চলে আসছে এই বিপদ্‌জনক কাজ। আদিম সময়ে এটা ছিল বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে কিন্তু নেশা কাটেনি। যারা জীবনের মায়া না করে এ নেশায় মেতেছে, তাদের সংখ্যা কমে গেছে নানা কারণে, কিন্তু একেবারে শেষ হয়নি। আজও আফ্রিকা, ভারত, পূর্ব-পাকিস্তান, বার্মা, মালয় আর দক্ষিণ-আমেরিকার আমাজান উপত্যকার জঙ্গলে, হিমালয়ের উপরে, গোবি মরুভূমিতে আর মাঞ্চুরিয়ার প্রেইরীতে মানুষ শিকার আর কিসের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রাণও দিচ্ছে। হাতে তাদের আজ পাথরের বর্শার বদলে আধুনিক রায়ফেল কিন্তু মনে আদিম মানুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রবৃত্তি।

দার্শনিক আর মনস্তত্ত্ববিদরা এ প্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণা কম করেননি, আর তাদের মধ্যে মতভেদেরও অন্ত নেই। এ নিয়ে শিকারীদের Sub-concious অর্থাৎ অবচেতন মনটাকেও কম খোঁচাখুঁচি করা হয়নি। কারো কারো মত হচ্ছে শিকারের মনস্তত্ত্বের পেছনে রয়েছে মানুষের আদিম হত্যা আর নিপীড়ন প্রবৃত্তি−Sadism; কারো মত হচ্ছে গতানুগতিক জীবন ধারায় বিতৃষ্ণ মানুষের নতুন কিছু করার মোহ। আবার এর ঠিক উল্টো অভিমতও আছে। সম্রাট আলমগীর বলেছেন ‘শিকার কারে বেকারানাস্ত’

অর্থাৎ শিকার বেকারের কাজ। এর কোন্‌টি সত্য ও নিয়ে আমি প্রবন্ধ ফেঁদে বসব না। শুধু এইটুকু বলব যে এ প্রবৃত্তির পেছনে যে কোন কারণ থাক্‌ একটা কথা সত্যি, সেটা হচ্ছে প্রত্যেক প্রকৃত শিকারীর জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা আছে আর তাদের তারা ভালও বাসে, মায়াও করে। যাদের নেশা হচ্ছে জীব হত্যা তারাই ওদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। কথাটা অনেকের কাছেই খাপছাড়া লাগবে। কিন্তু নেহায়েৎ সত্য। এ একটা অদ্ভুত Paradox; আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাই। যে কয়জন শিকারী আমি দেখেছি, তাদের প্রত্যেককেই দেখেছি কোন প্রাণীর ওপর কোন রকম কষ্ট তারা সহ্য করতে পারেন না। যখন কোন জানোয়ারের উপর নির্দয় ব্যবহার দেখেছি, যতটা নিষ্ঠুরতা দেখেছি তার প্রত্যেকটিই হয়েছে অ-শিকারীকে দিয়ে; এ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। অনেকেই গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঘ শিকারী জীম করবেটের বই পড়েছেন; নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, এত বড় শিকারী কিন্তু কি অদ্ভুত তার দরদ বন্য জন্তু জানেয়ারের উপর। প্রত্যেক ভাল শিকারীই এই ধরণের।

আমার একটা কারণ মনে হয় এই Paradox-এর। ভাল শিকারীর একটা প্রধান গুণ হ'ল জানোয়ারের চিন্তা অনুসরণ করা; কথাটা বুঝিয়ে বলি। ধরুণ একটা Kill (মড়ি) পেলেন এমন জায়গায় জায়গাটা বেশ খোলা, জঙ্গল কম। খোঁজ করে দেখলেন ওখানে কাছে কোথাও পানি নেই। পানি প্রায় ২/৩ মাইল দূরে। আপনি যেমন দেখছেন বাঘটাও তেমনি এই দু'টো Point লক্ষ্য করেছে এবং আপনারও জানা আছে যে Kill (মড়ি)-এ আসবার আগে সম্ভব হলে বাঘ পানি খেয়ে আসে। তখন আপনি বাঘের চিন্তার অনুসরণ করলে সহজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন যে ওখানে দিনে বাঘ আসবে না এবং সন্ধ্যার পরও বেশ খানিকটা দেরী হবে। এই চিন্তার অনুসরণ করতে করতে এবং বার বার ওদের সংস্পর্শে আসতে আসতে ওদের সম্বন্ধে একটা সহানুভূতি জন্মে, আর এই সহানুভূতি থেকে আসে একটা ভালবাসা।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা বেশ মজার ব্যাপার। কিন্তু এর চেয়েও মজার হচ্ছে এই, জীব-জানোয়াররা বুঝতে পারে কারা কোন শ্রেণীর লোক এবং এতে ওদের কখনো ভুল করতে দেখিনি। কুকুর যে লোকের চরিত্র বোঝে তা যাদের কুকুর সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানেন; তেমনি অন্যান্য জানোয়ারও বোঝে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কোলকাতার চিড়িয়াখানার লেপার্ড, জানোয়ার ইত্যাদির যে লম্বা ঘরটা আছে পুকুরের পাশে, সেটার পেছন দিক দিয়ে আমরা আসছিলাম সব দেখতে দেখতে। হঠাৎ ঘরটার অপর দিকে অর্থাৎ পুকুরের দিকে গোলমাল আর হুলস্থূল শুনতে পেলাম। মনে হ'ল একটা বাঘের শব্দ পেলাম। দেখলাম লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। প্রথমে ভাবলাম কোন একটা কিছু বাইরে বেরিয়ে পড়েছে কোন রকমে। সঙ্গে ছিল আমার বোন আর ওর স্বামী। হাত বাড়িয়ে বোনকে টেনে আমার পেছনে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু দাঁড়িয়ে বুঝলাম, না কোন কিছু বেরোয়নি। ঘরের কোণটা ঘুরে এদিকে এসে দেখি পুকুরপাড় একদম ফাঁকা; দূরে গাছতলায় কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে আমার একটুও সন্দেহ রইল না যে তারা ওই গাছের মগডালে উঠতে এক সেকেন্ডের বেশী সময়ের নোটিশ চায় না। এগিয়ে গিয়ে ফ্যাকাসে লোকদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? সে আঙুল দিয়ে একটা লেপার্ডের দিকে দেখিয়ে বলল– ঐ যে বাঘটা দেখছেন মশাই। বাপরে কি পাজী বাঘ! একটা ছোকরা ঢিল মেরেছে না কি করেছে, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে এসে শিকের উপর পড়েছে। অন্য বাঘগুলো তো অমন করে না।

কৌতুহল হ'ল। সত্যি তো অন্য বাঘগুলো অমন করে এসব নিরীহ লোকগুলোকে ভয় দেখায় না। শিকের কাছে গিয়ে দেখি ওধারে একটা কাঠের গুড়ির উপর চুপচাপ বসে দূরের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কিচ্ছু জানে না। শুধু চোখে একটা চাপা দুষ্টামি। বাঘের ভাষা কিছুটা জানা আছে। খুব আস্তে ওকে ডাকলাম। চম্‌কে ফিরে চাইল। বিস্ফোরিত দৃষ্টি। আমাদের কাউকে কাম্‌স্‌কাটকায় দু'বছর বাস করবার পর হঠাৎ যদি রাস্তায় কেউ বাংলা ভাষায় তাকে ডাকে তবে যে রকম মুখের ভাব হবে তেমনি। কবির ভাষায়– "আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।" ঠায় বসে তাকিয়েই রইল। পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর চোখের পানে তাকিয়ে আবার ডাকলাম, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা চলে এল এপাশে। তারপরে বের হয়ে আমার কাছে আসার কি চেষ্টা। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়।

প্রচণ্ড ইচ্ছা করছিল ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ওকে আদর করতে। কিন্তু এর আগে নাকি একটা বাঘ না সিংহ হাত বাড়িয়ে একজন লোক জখম করায় গবেট কর্তৃপক্ষ লোহার জাল লাগিয়ে একদম বন্ধ করে দিয়েছে। জালের ফাঁক এতটুকু। ওরই মধ্য দিয়ে আঙ্গুল গলিয়ে যতটুকু পারা যায় ওর ঘাড় চুলকে দিতে লাগলাম। এই বাঘটাই কয়েক মিনিট আগে এক ধমকে সমস্ত জায়গাটা ফাঁকা করে দিয়েছে। তামাসা দেখে চারদিকে ভীড় জমতে চলে এলাম। তাই বলছিলাম শিকারীরাই ভালবাসে বন্য জানোয়ার, আর ওরাও বোঝে সে কথা।

আমাদের পোষা বাঘ বিউটি ও আমি

তিন

গোড়ার কথা

সে কথা যাক! এখন আমরা আসল কথায় আসি। শিকারের একদম গোড়ার কথা হ'ল যাকে আপনি শিকার করছেন তার সঙ্গে দেখা হওয়া। সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে এরই খেলা। শিকারীর মাথা খাটানো, সমস্ত বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য হ'ল কেমন করে শিকারের সঙ্গে দেখা হয়। আর শিকারের একমাত্র চেষ্টা হ'ল কেমন করে এই দু'পেয়ে জানোয়ারটার সঙ্গে মোলাকাত হওয়াটা এড়ানো যায়। আপনাদের মধ্যে কাবুলীদের কাছ থেকে যদি কেউ টাকা ধার করে থাকেন কোনদিন তবে তার পক্ষে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। মোটকথা শিকারের আসল অংশটুকুই হ'ল এই লুকোচুরি। বুদ্ধির খেলায়, সতর্কতায়, ধৈর্য্যে কে কাকে হারাতে পারে। তারপর দেখা হয়ে গেলে বন্দুকের ঘোড়া টেপা শুধু। সাধারণতঃ পরিসমাপ্তি এখানেই।

বলেছি সাধারণতঃ; যদি ঘোড়া টেপার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটার সমাপ্তি না হয় তবেই মুশকিল বাঁধল। তখন অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়বে– তীক্ষ্ণদৃষ্টি, প্রখর শ্রবণশক্তি আর সর্বোপরি লোহার মত স্নায়ু। এর যে কোনোটার অভাব মৃত্যু ডেকে আনতে পারে।

এই যে শিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ– এর জন্য কতগুলো ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। সাধারণতঃ এইগুলোই বেশী ব্যবহার হয়। আবার পাকা শিকারী অনেক সময় মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন ফন্দী বের করেন শিকারকে বোকা বানাবার জন্য। ধরাবাঁধা নিয়মের প্রথমটা হ'ল ঝাড়ু, ইংরেজীতে Beat; এটা করতে হলে প্রথমে একটা বা দু'টো জঙ্গল এমন খুঁজে বের করতে হবে যেখানে খুব সম্ভব শিকার আছে। শিকার

সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হবার জন্য অনেকে ভাল জঙ্গল বেছে নিয়ে তার মধ্যে একটা গরু বা মোষ বেঁধে রাখেন। এক দিন হোক বা তারও বেশী হোক, একদিন না একদিন ওটাকে বাঘ নিশ্চয়ই মারবে। তখন সেই জঙ্গলটাকে ঝাড়ু দেওয়া হয়। প্রথমে দেখতে হয় তাড়া পেলে বাঘটা কোন দিকে যেতে চাইবে। একে বলা হয় 'রোখ্'। জঙ্গলের সেই প্রান্তে শিকারীদের বসতে হয়। গাছ পেলে গাছের উপরে বসাই ভাল। খানিকটা নিরাপদও আর চট্ করে শিকারীকে দেখতেও পাওয়া যায় না। আর যদি ভাল গাছ না থাকে তবে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে বসতে হয় যাতে শিকার সহজেই শিকারীকে দেখতে না পারে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Camouflage। যুদ্ধের মধ্যেও এই Camouflage ব্যবহার হয়।

তারপর আরম্ভ হ'ল ঝাড়ু। এতে অনেক লোকজন দরকার। জঙ্গল যত বড় হয়, লোকও তত বেশী দরকার। এদের হাতে থাকবে কেরোসিনের খালি টিন, ঢোল, ঘণ্টা ইত্যাদি জোর আওয়াজ করার যা কিছু দরকার। সঙ্কেত পেলেই এরা সবাই ভীষণ গণ্ডগোল করতে করতে জঙ্গলের ঠিক অপর প্রান্ত থেকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শিকারীদের প্রান্তের দিকে এগুতে থাকবে। এখন জঙ্গলে যদি শিকার থেকে থাকে তবে তা ভীষণ গোলমাল আর তাড়া খেয়ে স্বভাবতই ও জঙ্গল থেকে বার হয়ে পাশের অন্য কোন জঙ্গলে যেতে চাইবে। আর ঐ যাওয়ার পথেই বসে শিকারীরা। জঙ্গল থেকে বার হয়েই তাই তারা পড়বে শিকারীদের সামনে। তখন শিকারী শিকারকে লক্ষ্য করে গুলী করবেন। সংক্ষেপে এই হ'ল ঝাড়ু।

তারপর হচ্ছে মড়ি। ইংরেজীতে Kill; এটা আবার দু'রকমের। স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক। গরু বা মোষের পাল চরতে চরতে জঙ্গলে বা কাছাকাছি কোথাও গেছে, ওর মধ্যে একটাকে মেরে ফেলল বাঘে বা লেপার্ডে। এটা হ'ল স্বাভাবিক মড়ি বা Natural Kill। বনের মধ্যে মারা হরিণ বা অন্যান্য জানোয়ারও বাঘে মারলে ওটা স্বাভাবিক মড়ি। আর অস্বাভাবিক মড়ি হ'ল, শিকারী ইচ্ছা করে জঙ্গলের মধ্যে কোন কিছু বেঁধে রাখলে যদি বাঘে মারে।

শিকারীকে এমনি মড়ি খুঁজে বার করতে হয়। মড়ি পেলেই তার থেকে কাছাকাছি একটা জায়গা বন্দোবস্ত করতে হয় বসবার বা লুকোবার, এখানেও গাছ হলেই ভাল। না হলে ভাল ঝোপঝাড় বা মাটিতে গর্ত করে বসতে হয়। এখানেও খুব লক্ষ্য রাখতে হয় বাঘের কোন দিক দিয়ে আসার সম্ভাবনা। সেই বুঝে বসতে হয়। ভুল হলে পেছন দিক দিয়ে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। যদিও এতসব কাণ্ড করা শিকারের সঙ্গে দেখা

হবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আপনিও উদগ্রীব হয়ে আছেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, তবু ঠিক এই ধরনের মোলাকাতটা কোনও পক্ষে হৃদয়গ্রাহী হবে কিনা তাতে আমার বেশ সন্দেহ আছে।

তৃতীয় উপায় হচ্ছে Bait; এর বাংলা করা যেতে পারে 'টোপ'। প্রথমতঃ একটা জঙ্গল খুঁজে নিতে হয় যেখানে খুব সম্ভব বাঘ আছে। তারপর একটা সুবিধামত জায়গা বেছে সেখানে একটা ছাগল বা পাঁঠা বাঁধতে হয়। ছাগলটা যেন খুব চেঁচায়; ছালগটা বেঁধে দিয়ে একটা ভাল আড়াল করা জায়গায় বা গাছে বসতে হয়। ছাগলের ডাক যতদূর যায় এর মধ্যে যদি বাঘ থাকে তবে নিশ্চয়ই আসবে। আর আসলে সন্ধ্যার সময়টাতেই বা তার এক ঘন্টার মধ্যে। Bait এ বেশী রাতে বাঘ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই যে কটা উপায় বললাম– এ ছাড়া আরও কয়েক রকমভাবে শিকার করা হয়। শিকারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে, শিকার চলার রাস্তায় রাত্রে ঘোরাফেরা করে, রাস্তা ভাল থাকলে গাড়ী করে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে।

এই শেষটা সম্বন্ধে শিকারীদের মধ্যে খুব মতভেদ আছে। অনেক শিকারী ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে শিকার করাটাকে অ-শিকারী সুলভ অর্থাৎ Unsporting মনে করেন। Stanley Jepson তো একে একেবারে Cowardly, কাপুরুষতা বলেছেন। আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, গাড়ী আর ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে শিকার খোঁজার মধ্যে কাপুরুষতা নেই, কিন্তু শিকার দেখতে পেলে গাড়ীতে বসে ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় অনিশ্চিতভাবে গুলী করে দিয়ে গাড়ী নিয়ে পালিয়ে আসার মধ্যে নিশ্চয়ই কাপুরুষতা আছে। কিন্তু কেউ যদি শিকারকে গাড়ীর ফ্ল্যাশ লাইটে দেখে বন্দুক আর গান লাইট অর্থাৎ বন্দুকে লাগানো টর্চ নিয়ে নেমে যান, আর রাস্তা ছেড়ে বনের ভিতর শিকারের কাছাকাছি গিয়ে তাকে গুলী করেন– তবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কাপুরুষতা নেই। এতে বিপদের সম্ভাবনাও অন্য যে কোন রকম শিকারের চেয়ে বেশী বই কম নয়।

যাই হোক, এসব ছাড়া আরও কয়েকটি উপায় আছে। যেমন শিকারের ডাক নকল করে ডেকে আনা ইত্যাদি। কিন্তু খুব বেশী পাকা আর অভিজ্ঞ না হলে এসব করতে যাওয়ায় খুব বিপদ আছে।

এই তো গেল মোটামুটি শিকার পাবার উপায়। দেখা তো হ'ল। এবার করবেন ওকে গুলী। কি দিয়ে? এই আবার এক গণ্ডগোলের প্রশ্ন। এক এক শিকারীর এক এক মত। কেউ কেউ পছন্দ করেন এমন বন্দুক বা রায়ফেল যা থেকে ভারী গুলী বা বুলেট ছোড়া যায়– আর এই গুলীর গতি বা Velocity অপেক্ষাকৃত কম। আবার অনেকে তীব্র গতির ছোট অপেক্ষাকৃত হালকা বুলেটের পক্ষপাতী। এ নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে, অনেক বই লেখা হয়েছে। সবিস্তারে তা লিখতে গেলে এ বইয়ে কুলাবে না। কাজেই এ সম্বন্ধে আমার চুপ করে যাওয়াই ভাল। শুধু দু'একটা কথা বলছি। এটুকু মনে রাখলেই আটকাবে না।

প্রথমতঃ একটা হচ্ছে রায়ফেলের বোর। বোরটা ইংরেজী শব্দ Bore; আপনার রায়ফেলের নলের ছিদ্রের ব্যাস বা Radius। এক ইঞ্চিকে ১০০০ ভাগ করলে তার কত ভাগ হচ্ছে নলের ব্যাস এই হ'ল মাপ। যেমন– মনে করুন আপনার রায়ফেলটার ওপর লেখা আছে .৩৫০ বোর। কি বুঝবেন? ওটা বোঝাচ্ছে যে এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের ৩৫০ ভাগ হচ্ছে আপনার রায়ফেলের নালের ছিদ্রের ব্যাস। তেমনি .৫০০ বোরের রায়ফেলের নলের ব্যাস হচ্ছে ঠিক আধ ইঞ্চি।

দ্বিতীয়টা হচ্ছে রায়ফেলের শক্তি। এটার হিসাব হোচ্ছে ফুট পাউন্ড (ft.Ib.) এক পাউন্ড ওজনের কোন জিনিসকে যদি আপনি টেবিলের ঠিক এক ফুট ওপর থেকে ছেড়ে দেন, তবে ওটা যতখানি জোরের সাথে টেবিলের ওপর গিয়ে পড়বে তার মাপ হ'ল ১ ফুট পাউন্ড (1 ft.Ib.)। তেমনি এক পাউন্ড না নিয়ে যদি আপনি ১০০ পাউন্ড ওজনের একটা পাথর নিয়ে এক ফুট ওপর থেকে ছেড়ে দেন, হয় টেবিল ভেঙ্গে যাবে, নয় ওটা যত খানি জোরে পড়বে তার মাপ হচ্ছে ১০০ ফুট পাউন্ড।

গতি মাপা হয় ফিট সেকেন্ড (ft. sec.) দিয়ে। অর্থাৎ বুলেটটা এক সেকেন্ডে কত ফিট যায়। আর সাধারণতঃ এ মাপগুলো ধরা হয় ঠিক যে মুহূর্তে বুলেটটা নল ছেড়ে বেরোয় তখন থেকে।

ধরুন, আপনার ঐ বোরের বন্দুকের বুলেটের গতি বা Velocity হ'ল ২৭০০ ফিট সেকেন্ড আর শক্তি বা Energy হ'ল ৩৩০০ ফুট পাউন্ড। এতে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার রায়ফেলের বুলেটের গতি প্রতি সেকেন্ডে ২৭০০ ফিট আর একটা ৪০ মন পাথর মাটির এক ফুট উঁচু থেকে ছেড়ে দিলে যতখানি জোরের সঙ্গে মাটিতে আঘাত করবে ঠিক ততখানি শক্তিতে বুলেটটা আঘাত করবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা বন্দুক বা রায়ফেলের শক্তি সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি শুধু এই দু'টি হিসাব জানলেই। অবশ্য বুলেটের ওজনও একটা দরকারী বিষয়। কিন্তু বলেছি তো খুটিনাটি বিষয়ে গেলেই এক বিষয়ের সুতো গুটোতে গুটোতে অগুন্তি বিষয় এসে পড়বে। কাজেই শুধু এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, বুলেটের যে ওজন দেওয়া থাকে তা ঠিকই থাকে এবং নরম চামড়ার জানোয়ার যেমন বাঘ, সিংহ, লেপার্ড ইত্যাদির জন্য নরম বুলেট ব্যবহার করা হয় যা শিকারের গায়ে লাগলে ফেটে যায় এবং বেশী ঘায়েল করে, অর্থাৎ Soft nose; আর শক্ত চামড়ার জানোয়ার যেমন গণ্ডার, হাতী, মোষ ইত্যাদির জন্য শক্ত বুলেট বা Solid সর্বদা ব্যবহার করতে হয়। কারণ বুলেটকে শক্ত মোটা চামড়া ভেদ করতে হয়।

এ সবই হ'ল রায়ফেল সম্বন্ধে। শট্‌গান সম্বন্ধে শুধু ফিট পাউন্ড আর ফিট সেকেন্ড ছাড়া অন্য মাপগুলো প্রযোজ্য নয়। শট্‌গানের নলের বোর (Bore) অর্থাৎ নলের ছিদ্রের মাপ অনেকগুলি আছে। ৪ (চার) থেকে ৪১০ (চারশত দশ) বোরের এই

মাপগুলি রায়ফেলের বোরের মাপের মত ইঞ্চি বা মিলিমিটারভিত্তিক নয়। শট্‌গানের বোরের মাপ এইভাবে করা হয়ঃ-

১ পাউন্ড শীশাকে (Lead) একই সাইজের গোল গোল বলে পরিণত করলে যতগুলি বল হবে তার যে কোন একটির ব্যাস সেই শট্‌গানের নলের বোর (Bore) হবে। উদাহরণস্বরূপ ১ পাউন্ড শীশাকে (Lead) ১০টি নিখুঁত সমান গোল বলে ভাগ করা হলে ওর যে কোন একটি বলের ব্যাসের সমান মাপের নলের ছিদ্র হবে ১০ বোরের বন্দুকের (Shot gun)। এইভাবে ঐ ১ পাউন্ড শীশাকে ১৬ ভাগে গোল গোল বলে ভাগ করলে ওর যে কোন ১টি বলের ব্যাসের সমান নলের ছিদ্রবিশিষ্ট বন্দুক হ'ল ১৬ বোরের (Bore) বন্দুক। এই হ'ল বিভিন্ন বোরের শট্‌গানের নলের মাপ।

পৃথিবীর সবখানেই ১২ বোরের শট্‌গানের প্রচলন বেশী। এই ১২ বোরের (Bore) মাপও ঐ অন্য বোরের শট্‌গানের মতই। অর্থাৎ ১ পাউন্ড শীশাকে (Lead) ১২টি সমান নিখুঁত গোল গোল বলে পরিণত করলে ওর যে কোন একটির ব্যাস (Diameter) হ'ল বার বোরের বন্দুকের (Shot gun) নলের ছিদ্রের ব্যাসের (Diameter) সমান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রায়ফেল ও বন্দুকের আরো একটি বিশেষ তথ্য আছে, তা হ'ল এই যে, রায়ফেলের নলের ভেতর রায়ফেলিং করা থাকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে গুলী বা বুলেটটাকে লাটিমের মত প্রচণ্ড বেগে পাক খাইয়ে দেয়া।

আমি দেখেছি এক ধরণের শিকারী বড় জন্তু শিকারেও রায়ফেলের চেয়ে শট্‌গান পছন্দ করেন। তারা বলেন বাঘ, লেপার্ড ইত্যাদির জন্য রায়ফেলের দরকার করে না, শট্‌গানই যথেষ্ট। উদাহরণ হিসাবে তারা বলেন যে সুন্দরবনের টাইগারগুলো অধিকাংশই শট্‌গান দিয়ে মারা পড়ে। এদের মধ্যে একটা দল আছে যাদের শট্‌গান পছন্দ করার প্রধান কারণ তারা রায়ফেল দিয়ে ঠিকমত গুলি লাগান কঠিন মনে করেন––অর্থাৎ হাত ভাল নয়। কিন্তু তারা স্বভাবতই তা উল্লেখ করেন না। আর এক দল যেভাবে শিকার করেন তাতে শট্‌গান ঠিকই যথেষ্ট।

যেমন ধরুন সুন্দরবনের কথা। কথাটা সত্য। সেখানে যা বাঘ মারা পড়ে তার প্রায় সবই শট্‌গান দিয়ে। কিন্তু--আর এই 'কিন্তু'-টা মস্তবড় কিন্তু--এর কারণ আছে।

সুন্দরবন এমন একটা ভীষণ জায়গা যে বাইরে থেকে খুব কম শিকারীরাই রায়ফেল নিয়ে সেখানে শিকারে যান। যদিও বা যান তার অধিকাংশই লঞ্চ থেকে বসে বসে হরিণ মারেন– শুধু বাঘের খোঁজে বনে ঢোকেন না।

বাঘ যা মারা পড়ে তা সুন্দরবনসংলগ্ন গ্রামগুলো থেকে গ্রাম্য শিকারীদের হাতে, যাদের কাছে শট্‌গানের ওপরে কিছু নেই। আর তাছাড়া তারা যে উপায়ে শিকার করেন তাতে বলেছি––শট্‌গানই যথেষ্ট।

প্রথমতঃ ওরা ২/৪ দিন বা সপ্তাহ খানেক ধরে একটা বিশেষ বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করে। এটা সুন্দরবনে বেশ সহজ। কারণ দিনে দু'বার করে সমস্ত বনটা সমুদ্রের জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়– আর সব কাদা হয়ে থাকে; পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখা যায়। এই পায়ের ছাপ দেখে ওরা বুঝতে পারে জোয়ারের সময় আর ভাটার সময় বাঘটা কোথা থেকে কোথায় যায়। তারপর সময়মত সেই গাছে উঠে নিরাপদে বসে থাকে। ওদের ভাষায় একে বলে 'গাছাল'।

বাঘেরও অভ্যাস নিশ্চিন্ত মনে ঐ পথেই ও চলবে– অন্য পথে না। ঠিক গাছের নিচে এলেই শিকারী ভাল করে নিশানা করে গুলী করবে। বাঘ ওখানে পড়বে না, কারণ হঠাৎ কোন মারাত্মক জায়গায় না লেগে গেলে শট্‌গানের সাধ্যই নেই বড় বাঘকে ওখানে ফেলবার। আর তাছাড়া শিকারীও চায় না যে ওখানেই পড়ুক। তাহলে বিপদ। গুলী খেয়ে বাঘ লাফ দিয়ে চলে যাবে। তারপর খানিক অপেক্ষা করে যখন বুঝবে যে বাঘ অনেক দূরে চলে গেছে, গাছ থেকে নেমে নৌকায় ফিরে আসবে; তখন আর বাঘের পেছনে যাবে না। পরদিন কয়েকজন একত্র হয়ে বাঘের পায়ের দাগ অনুসরণ করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওরা বাঘকে পাবে অনেক দূরে– রক্ত পড়ে পড়ে রাত্রেই মরে পড়ে আছে।

এই শিকারের সঙ্গে যারা শিকারকে Sport হিসাবে নেন তাদের শিকারের অনেক তফাৎ। তারা চান--তারা শিকারকে মেরে তখনই সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কোন ভাল শিকারীই শিকারকে কষ্ট দিতে চান না।

শিকারকে আহত করে চলে আসা– শিকারীদের দুনিয়ায় এর চেয়ে লজ্জাকর কিছু নেই। এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আহত জানোয়ারের পেছনে বন জঙ্গলে ঢুকে অনেক ভাল শিকারী চিরজনমের মত পঙ্গু হয়েছেন, অনেকে জান দিয়েছেন। একটা শট্‌গান, শট্‌গান কেন, তার চেয়েও কম শক্তিশালী বন্দুক একটা বাঘ বা লেপার্ডকে মারার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু ওদের কেউ যদি আক্রমণ করে তবে শট্‌গানের

সাধ্য নেই সে চার্জ রুখে দেবার। তাই লাখ টাকা দিলেও আমি সুন্দরবনে শট্‌গান হাতে নিয়ে ঢুকব না।

শিকারকে কোথায় গুলী করতে হয় এ প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ কোন মতবিভেদ নাই। বড় ছোট সব শিকারীই একমত হৃৎপিণ্ড – Heart.

কিন্তু এবারে আমার একটু সবিনয় নিবেদন আছে। চিরাচরিত প্রথানুসারে আমিও ছোট বয়স থেকেই শিকারের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করেই মারতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু তারপর ক্রমশঃ লক্ষ্য করে দেখলাম যে যদিও আমার গুলী ঠিক হৃৎপিণ্ডতেই লাগছে এবং হৃৎপিণ্ডের সাথে সাথে ফুসফুস ইত্যাদিও একেবারে চুরমার করে দিচ্ছে, তবুও শিকার ঠিক গুলীর সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পড়ছে না– কিছু না কিছু দূর যাচ্ছেই। আর ঐ কিছু দূরের মধ্যে যদি একবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল তো হয়ে গেল। রাত হলে তো রক্তের দাগ ধরে অনুসরণ করার কথাই নেই– যদি দিনও হয় আর যদি না মরে থাকে তো শিকারীর জন্য জান নিয়ে ফিরে আসা প্রশ্নের বিষয়। আর যদি মরে গিয়েও থাকে তবু তা জানবার উপায় নেই। সে রাত্রে কিচ্ছু করা যাবে না। শিকারের জায়গা থেকে ক্যাম্প যদি দূরের রাস্তা হয়ে থাকে তবে কষ্টের একশেষ। রাত্রে ক্যাম্পে ফিরে এসে পরদিন সকালে আবার সেইখানে ফিরে গিয়ে খোঁজা খুঁজি যা করবার করতে হবে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

আমার মারা সবচেয়ে বড় বাঘ (আট ৮ ফিট ৪ ইঞ্চি)। রতনপুরে আমাদের শিকারের বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছবিটি তোলা।

চার

ব্যতিক্রম

শিকারের উদ্দেশ্যে একবার বনে গিয়েছিলাম। বয়স তখন কম, ১৮ কি ১৯ বছর হবে। একই উদ্দেশ্যে আমার ক্যাম্পে তখন গিয়েছিল আমার মামা মাহমুদ হোসেন– ডাক নাম পিটু। আমার সমবয়সী আর ছোটবেলা থেকে একত্রে বড় হয়েছি বলে সম্পর্কটা মামা ভাগ্নের চেয়ে বন্ধুর মতই বেশী ছিল। আর ছিল আনোয়ার, আমার চাচাতো ভাই।

প্রায় সপ্তাহ খানেক ঘোরাঘুরি করে কিছুই হ'ল না। ওখানকার হাটে প্রচার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল বাঘের খবর আনলে পুরস্কার দেওয়া হবে ইত্যাদি। কিন্তু বসে বসে বিরক্তি ধরে গেল। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা একটা লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিল বাঘে একটা বড় বলদ মেরেছে। ক্যাম্পে যেন একটা বোম্ ফেটে গেল। যে শুয়ে ছিল সে উঠে বসল। যে বসে ছিল সে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। এই খানা আনতে বল্। আরে গুলীর ব্যাগটা কই গেল। ফ্ল্যাস্কে চা ভর্– নানারকম হুলুস্থুল আরম্ভ হয়ে গেল। লোকটাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম আমাদের ওখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে একটা গ্রামের মোড়লের জামাই সে, সেই মোড়লেরই একটা বলদ কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাঘে মেরেছে এই সন্দেহ করেই আজ কয়েকজন খুঁজতে বেরিয়েছিল বনে। ঠিক তাই! ঘণ্টা দু'য়েক আগে মাত্র ওরা খুঁজে পেয়েছে বলদটাকে। একটা বাইদের এক কোণে পড়ে আছে, পেছন থেকে বেশ খানিকটা খেয়ে গেছে। এখানে বাইদ শব্দটার অর্থ বলে নিই, নইলে অনেকেরই অসুবিধা হবে বুঝতে। আমাদের বনে অর্থাৎ গারো পাহাড় থেকে যে বনটা মুধুপুর হয়ে প্রায় ঢাকা পর্যন্ত এসেছে তাতে বড় উঁচু কোন পাহাড় নেই। ছোট ছোট টিলার সমষ্টি। এই টিলাগুলো গজারী বন দিয়ে ঢাকা। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলে 'চালা' বা ট্যাক্। আর টিলাগুলোর ফাঁক দিয়ে যে খানিকটা সমতল জমি এগুলোকে বলে বাইদ। অনেকটা উপত্যকার ছোট সংস্করণ আর কি। এই বাইদগুলোতে সাধারণতঃ ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

যাই হোক মোড়লের জামাই একটা বুদ্ধির কাজ করে এসেছিল। কতগুলো ডালপাতা দিয়ে মড়িটাকে ঢেকে এসেছিল যাতে করে শকুনের দৃষ্টি না পড়ে ওর ওপর। সব

খবর দিয়ে শেষে সে নিজের অভিমতটা ছাড়ল, 'হুজুর! বাঘটা বড় বাঘ!' বড় বাঘ এরা বলে বেঙ্গল টাইগারকে। জিজ্ঞেস করলাম– 'দেখেছ?' ও বলল, 'না- দেখিনি কিন্তু এত বড় বলদ কি আর ছোট বাঘে মারতে পারে?' বললাম, 'চল– মড়ি দেখলেই বুঝতে পারব।'

খুব তাড়াতাড়ি ছুটেও ৩ টার আগে পৌঁছুতে পারলাম না। মড়ি দেখেই বড় বাঘের আশা ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। দেখলাম চিতা অর্থাৎ লেপার্ডের মড়ি। অবশ্য বেশ বড় লেপার্ড। অনেকে জিজ্ঞেস করবেন কি করে বুঝলাম যে ওটা টাইগার মারেনি। বড় বাঘের মড়ির ঘাড় নিশ্চয়ই ভাঙ্গা থাকবে। ওরা শিকারের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ওপর থেকে ঘাড় কামড়ে ধরে আর এক থাবা বাড়িয়ে শিকারের মুখ বা মাথাটাকে ধরে এক হ্যাচ্‌কা টানে ঘাড়টা মট্ করে ভেঙ্গে দেয়। লেপার্ড তা করে না। সেও অবশ্য ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরে কিন্তু ঘাড় ভাঙ্গে না। তার বদলে নিজের শরীরের ওজন দিয়ে শিকারের ঘাড় মাটির ওপর চেপে ধরে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যে শিকার দম বন্ধ হয়ে মরে যায়।

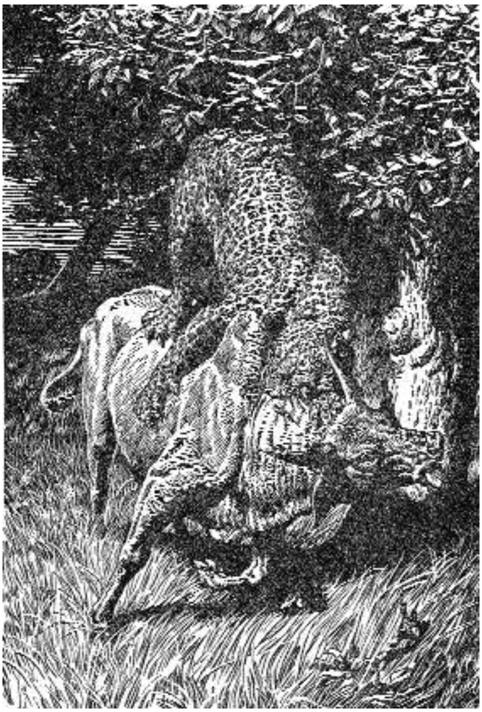

শিকার যদি একটু বড় হয় অর্থাৎ যদি লেপার্ডের শরীরের ওজন ওকে মাটিতে চেপে ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তবে অনেক সময় লেপার্ড নিজের শরীরকে উল্টোদিকে অর্থাৎ যে দিক থেকে লাফ দিয়েছিল তার অপর দিকে উল্টিয়ে দেয় কিন্তু কামড় আলগা করে না একটুও। এইবার শিকার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

অনেক শিকারীরও ধারণা যে বাঘ ইত্যাদি শিকারের গলা নিচ থেকে কামড়ে ধরে। এ ধারণার পেছনে একটা কারণও আছে। মড়ির গলা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বাঘের সামনের বড় দাঁত চারটে

যাকে ইংরাজীতে বলে Canine teeth গলার নিচের দিকে বসেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে নিচ থেকেই কামড়টা বসেছে। কিন্তু আসলে এটা একদম ভুল ধারণা। বাঘ কামড় দেবার সময় এত বড় হা করে এবং ওপর থেকে যে চাপ বা Pressure পড়ে তা এত বেশী যে বড় দাঁতগুলো গলার পাশটা পার হয়ে নিচের দিকে বসে যায়। তাই ওরকম দেখায়।

এই ফাঁকে আর একটা প্রচলিত ভুল ভেঙ্গে দেই। অনেকেরই বিশ্বাস যে বাঘ, সিংহ এরা শিকার মেরে প্রথমে তার রক্ত চুষে খেয়ে নেয়। একদম বাজে বিশ্বাস। বেড়ালকে কোন জিনিস চুষে খেতে দেখেছেন কখনও? ওদের চুষে খাওয়ার শক্তিই নেই। তবে হ্যাঁ, শিকার মারার সময় যা রক্ত বের হয়ে পড়ে ওটা ওরা চেটে সাফ করে ফেলে। অথচ বেশ নামকরা ইংরেজ শিকারীর লেখায়ও আমি এ ভুল কথা পড়েছি।

যাক যা বলছিলাম। বুঝলাম তো যে লেপার্ড মেরেছে। কিন্তু মুশকিলে পড়লাম বসা নিয়ে। এতগুলো লোক বসি কোথায়? আমরা তিনজন, খানসামা হাসমত আরও ২ জন লোক সঙ্গে নিয়েছিলাম কম্বল, ফ্ল্যাস্ক ইত্যাদি বইবার জন্য। লোক ২ জনকে কোন বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব তারও উপায় নাই। সবচেয়ে কাছে হ'ল সেই মোড়লের বাড়ী, আর সেটাও দেড় মাইল দূর। কাছে একটাও বসবার গাছ নেই। সব ছোট ছোট গজারীর চারা। শুধু শ' খানেক গজ দূরে একটা বড় গাছ। মড়িটাকে যদি টেনে ঐ গাছটার কাছে নিয়ে যাই তবে সবাই বেশ আরামে বসতে পারি কিন্তু তা আবার সমস্ত শিকারটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। কিন্তু আর কোন উপায় না দেখে শেষে তাই-ই করা ঠিক করলাম।

টেনে নিলাম মড়িটাকে ঐ বড় গাছটার কাছে; কিন্তু কাজটা করলাম খুব সতর্কতার সাথে। গাছ থেকে গজ ত্রিশেক দূরে ওটাকে একটা সুবিধামত জায়গায় রেখে গলার ভেতর দিয়ে একটা খুঁটি মাটির মধ্যে শক্ত করে পুঁতে দিলাম। অন্ধকার রাত। বলা যায় না নিঃশব্দে এসে যদি মড়িটাকে সরিয়ে ফেলে তবে সব পণ্ড হবে।

সব শেষ করে প্রথমে যেখানটায় মড়ি ছিল ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। উদ্দেশ্য নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। বাঘতো প্রথমে আসবে যেখানে সে তার মড়ি রেখে গেছে সেইখানে। এসে তো দেখবে মড়ি নেই। তখন যাতে ওখানেই দাঁড়িয়ে মড়ি দেখতে পেরে এখানে চলে আসে সেই জন্য এই ব্যবস্থা করা। বাঘ, সিংহ এগুলোর যদি ঘ্রাণশক্তি থাকত তবে আর আমায় এসব করতে হত না। যাই হোক, দাঁড়িয়ে দেখলাম

মড়ি বেশ দেখা যাচ্ছে। তবুও যা কিছু বাধা পড়ছিল তা সাফ করিয়ে দিলাম; কিন্তু তবুও সামান্য একটু ভুল করে ফেললাম। সেটা হ'ল এই যে আমি তো আমার পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি উঁচু চোখ দিয়ে মড়ি দেখছি পরিষ্কার– কিন্তু বাঘের চোখ তো মাটি থেকে মাত্র তিন সাড়ে তিন ফিট উঁচু, ও দেখবে কি করে? আমি যদি নিচু হয়ে বসে নেই তাহলে আর এ ভুলটা হয় না। কত সামান্য ভুলের জন্য শিকারটাই প্রায় পণ্ড হয়ে যাচ্ছিল।

সব ঠিকঠাক করে আমরা গাছে যখন বসলাম তখন ৪টা বেজে গেছে। মোড়লের জামাইটিকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম; বলে দিলাম শিকার হোক না হোক আমরা এখান থেকেই ক্যাম্পে চলে যাব। তারপর সব চুপচাপ। কোন কথা নেই, নড়াচড়া নেই, সিগারেটটা পর্যন্ত খাওয়া নেই। শুধু পাথরের মত বসে থাকা, কতক্ষণ কে জানে, আধ ঘণ্টাও হতে পারে, সারারাতও হতে পারে। অন্য শিকারীর মনে কি হয় জানি না– আমার মনে এই সময়টা দুনিয়ার যত ভাবনা চিন্তা আর যাকে বলে দিবাস্বপ্ন সব ভীড় করে আসে।

মনে আছে সেদিনের প্রধান চিন্তা ছিল দু'টো। একটা হচ্ছে হাতের রায়ফেলটা, আমার ১২ বোরের বন্দুকটা দিয়েছিলাম পিটুর হাতে। আমার কাছে ছিল আব্বার প্রচণ্ড শক্তিশালী .৪৭০ বোরের দোনলা রায়ফেল। ওর এক গুলীতে আফ্রিকার বিরাটতম জঙ্গলা হাতীও ঘুরে পড়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ও সামনে যেমন হাতী ফেলে দিতে পারে তেমনি পেছনে দিকে আমাকেও গাছ থেকে ফেলে দিতে পারে। রায়ফেলটা ভীষণ লাথি মারে (Recoil)। দ্বিতীয় হচ্ছে পিটুর কাশি। সর্দি লেগে ওর হয়েছিল খুব কাশি। উৎসাহের মাথায় তো গাছে চড়ে বসেছে, এখন এই লম্বা সময় কাশি আটকে বসে থাকতে পারবে কিনা, একটু খুক্ করলেই তো সর্বনাশ।

বসে বসে এইসব ভাবছি। সূর্য পশ্চিমের গাছগুলোর মাথার আড়ালে নেমেছে। আস্তে আস্তে সন্ধ্যার অন্ধকার জমে আসছে। হঠাৎ শুনলাম এক ঝাঁক ছাতারের কোলাহল– জঙ্গলটার ওপারে। ভয় পেয়েছে। বুঝলাম বাঘ আসছে। যদিও জায়গাটা খুব নির্জন এবং আশা করেছিলাম জলদিই আসবে তবু এত তাড়াতাড়ি ভাবিনি। আরও সজাগ হয়ে বসলাম। গেল আরও প্রায় পনের মিনিট। তারপরই শুনলাম, ঐ যে হুজুর বাঘ!

এত করে উপদেশ, এত ট্রেনিং দেওয়া, যে শিকারে বসে কোন শব্দ করতে নেই, সব বাঘ দেখলে ভেসে যায়। কিছু করবার উপায় নেই; শুধু চোখ পাকিয়ে ধমক দিলাম। দেখি সত্যিই বেরিয়েছে তাগড়া একটা লেপার্ড। সম্মুখে যে লম্বা বাইদটা ছিল তার

ওধারে, আমাদের প্রায় সোয়া শ’ গজ দূরে। এতদূরে বলেই কথার আওয়াজটা শুনতে পায়নি। তারপরই যে দৃশ্য দেখলাম তা আমার মনে হয় কম শিকারীরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

জঙ্গল থেকে বের হয়েই ও বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসে থেকেই মাটিতে গড়াতে আরম্ভ করল। বেড়ালকে মাটিতে গড়াতে দেখেছেন নিশ্চয়ই। শুধু মনে করুন বেড়ালের বদলে মোটাসোটা একটা লেপার্ড। তারপর ওপর দিকে চার হাত পা দিয়ে খানিকটা আকাশ পানে চেয়ে রইল। দৃশ্যটা আজও আমার মনে আছে। তারপর উঠে বসে চারিদিকটা খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করল। আমরা পাথরের মত বসে আছি। দেখবে নাকি? যা চোখ। দেখল না। উঠে ধীরে সুস্থে চলল মড়ির পানে।

এই সময়টা ওকে লক্ষ্য করে গুলী করতে পারতাম, ভাবলাম এতদূর থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে অনিশ্চিত গুলীর কি দরকার। ওতো আসছেই মড়ির কাছে। ভুল যে একটা করে বসে আছি তখনও তা বুঝিনি। যাই হোক আগে যেখানটায় মড়ি ছিল সেখানে পৌঁছে মড়ি নেই দেখেই চট করে ডান দিকের বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

প্রতীক্ষা করে বসে আছি রায়ফেলের সেফটীতে বুড়ো আঙ্গুল ঠেকিয়ে। কিন্তু আর বাঘের সাড়া নেই। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে এল। দিনের আলোয় গুলী করার আশা মিটে গেল। এখন ভরসা রায়ফেলে লাগানো তিন সেলের গান লাইট। সন্ধ্যার পর বনের মধ্যে নানা রকম শব্দ শোনা যায়। এখানে খুচ্, ওখানে খট্, সেখানে মট্, এমনি হতেই থাকে। বসে বসে তাই শুনছি আর ভাবছি--কি হ’ল এখনও মড়ির কাছে আসছে না কেন? তবে কি আমাদের দেখতে পেয়েছে? তাই বা কেন হবে আমরা তো একদম কোন নড়াচড়া বা আওয়াজ করিনি। তখন কি জানি যে বাঘটা চার পাশ দিয়ে তার নিজের মারা মড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমনি করে বসে থাকতে থাকতে রাত ৮ টা বেজে গেল।

এরপর এল আসল পালা। এতক্ষণ পাথরের মুড়ির মত সব বসে ছিলাম। এখন হঠাৎ কাশি আটকে আমার গলা থেকে খুক্ করে একটু আওয়াজ আমার অজান্তেই বেরিয়ে গেল। খুব সামান্য মৃদু আওয়াজ। এক সেকেন্ড; তারপরই যেন আমার খুক্ আওয়াজের জওয়াবে ঠিক পায়ের তলা থেকে গ্যাক্ করে এক গভীর শব্দ আর তারপরই কি যেন একটা আমাদের গাছের তলা থেকে সর সর করে ধান ক্ষেত পার হয়ে বাঁ দিকের জঙ্গলটায় ঢুকে গেল।

খানিকক্ষণ সব চুপ। তারপর ফিসফিস করে পিটুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?' ও বলতে পারল না কিন্তু ফিস ফিস করে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে আমার দিকে ঘুরে বলল 'বাঘ'। বললাম, 'বাঘ? দুর'।

বললাম বটে দুর। কিন্তু দেখা গেল বাঘই। হাসমত, ওসমান আর ফেকু, তিনজনেই ভাল করে দেখেছে যে বাঘ। কিচ্ছু বলেনি আমাদের। যখন আর সন্দেহ রইল না যে সত্যিই বাঘ ছিল ওটা তখন তো বুঝলাম শিকার হয়ে গেল। মড়ি খুঁজতে খুঁজতে বাঘটা যখন আমাদের গাছের নিচে এসেছে ঠিক তখনই আমি খুক্ করে কেশেছি আর সব পণ্ড করেছি। ও খুক্ শুনেই ওপর দিকে চেয়ে আমাদের দেখেছে আর পালিয়েছে, আর আসবে না।

বললাম সাধারণ গলাতেই, 'নাও, আর লুকোচুরির দরকার নেই– দেখেই তো ফেলেছে। চল এবার। একজন একজন করে নাম। পিটুকে বললাম, 'এইবার কাশতে পার প্রাণ ভরে।' তারপর ও যখন কাশতে আরম্ভ করল তখন অবাক হয়ে গেলাম। আগে বুঝিনি ও এই সাংঘাতিক কাশি আটকে বসে ছিল সাড়ে চার ঘণ্টা। ওর সে কী ঘং ঘং ঘং। আমার মনে হচ্ছিল ক্যাম্প থেকে শোনা যাবে এ কাশির আওয়াজ। আজও আমি তারিফ করি ওর।

যাই হোক কম্বল, ফ্ল্যাস্ক ইত্যাদি নিয়ে সবাই নেমে এলাম। এইবার ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা দেব। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত চারিদিকে টর্চের আলো ফেললাম। ও কি! বনের যেখানটায় বাঘটা ঢুকেছিল সেখান থেকে কিছু ডাইনে ভেতর দিকে একটা চোখ জ্বল জ্বল করছে। দু'টো নয় একটা।

এখানে বলে রাখা ভাল– যে সব জন্তু বা পাখি নিশাচর অর্থাৎ অন্ধকারে চোখে দেখে তাদের চোখের ওপর কোন আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ Reflect করে। যে জন্তু যত বেশী দেখে তার চোখ তত বেশী Reflect করে। ভাল শিকারীরা এই আলো দেখেই বলে দিতে পারেন ওটা কিসের চোখ। নিশাচর পাখি যেমন বাদুড়, প্যাঁচা, Night Jar এদের চোখও Reflect করে তবে সাধারণতঃ পাখির একটা চোখ দেখা যায়। যখনকার কথা বলছি তখন এতটা শিখিনি তাই স্থির করতে পারলাম না ওটা কিসের চোখ।

চিন্তা করে একটা বুদ্ধি ঠিক করলাম। টর্চ নিবিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম– তারপর হঠাৎ আলো জ্বেলে দিলাম। যা ভেবেছিলাম তাই মনে হ'ল কে যেন

আমার দিকে আরেকটা টর্চ জ্বাললো আর জ্বেলেই ছোট হয়ে গেল। বুঝলাম জঙ্গলের আড়াল থেকে চেয়ে আছে বলে দু'টো চোখ একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না। বাঘই, এবং এখনও যায়নি। আবার আশা হ'ল হয়তো পেতেও পারি। সবাইকে বললাম– 'ওঠ আবার গাছে।'

আবার যে যার জায়গায় উঠে বসলাম। লুকোচুরির আর দরকার নেই। দেখেই তো ফেলেছে আমাদের। কথাবার্তা, চা, সিগারেট সবই চলল। মাঝে মাঝে এক একবার টর্চ জ্বালিয়ে চার পাশটা দেখে নেই– বের হয়েছে কিনা। রাত এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে টর্চ জ্বালিয়েছি, দেখি ৬০/৭০ গজ দূরে জঙ্গল থেকে বাইরে একটা খোলা জায়গায় শুয়ে বাঘটা সোজা আমাদের গাছের পানে তাকিয়ে আছে। পেছন দিকটা মাটিতে একদম শোয়ান, আর সম্মুখের দিকটা দুই কনুইয়ে ভর করে বসা। পিটু আর আনোয়ারকে বললাম– ও অপেক্ষা করছে কখন আমরা গাছ থেকে নেমে চলে যাব, তার পর আসবে মড়ি খেতে, এর চেয়ে কাছে ওকে আর পাওয়া যাবে না। তখন খুব ভাল করে নিশানা করলাম, সেই যে বলেছি হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে– আর ট্রিগার টেনে দিলাম।

রায়ফেলের লাথীটাকে বাদ দিলে প্রথম যে জিনিসটি লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে আমি গাছ থেকে পড়িনি; দ্বিতীয়– অন্ধকার, টর্চ জ্বলছে না; আরেকটা হ'ল– যেখানটায় বাঘটা ছিল সেখানে একটা ধুপ্ ধাপ্ আওয়াজ। রায়ফেলের নলের ওপরে যেখানে টর্চ লাগানো থাকে সেখানে হাত দিয়ে দেখি সেখানে টর্চই নেই।

শিকারের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। সবেমাত্র গুলী লেগেছে বাঘের গায়ে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি অন্ধ হয়ে আছি। বুকের মধ্যে দুম্ দাম্ আওয়াজ হচ্ছে। অন্ধকারেই হাতড়ে দেখি প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে টর্চ আট্কাবার ক্ল্যাম্প পিছলে সম্মুখে ঝুলছে। দু'টো ক্লাম্পের একটা তো নল ছেড়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে ঝুলছে। তাড়াতাড়ি টেনে পেছনে নিয়ে এসে সুইচ টিপে দেখি জ্বলে না। পিটুর কাছে আমার ১২ বোরের বন্দুকটাতেও টর্চ বা Gun Light লাগানো ছিল। তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে সেটা নিয়ে আলো জ্বালালাম। বাঘ নেই। সেই ধুপ্ ধাপ্ আওয়াজও নেই।

এই পড়লাম মুশকিলে। গুলী লেগেছে কিনা এবং লাগলে তা কতখানি মারাত্মকভাবে লেগেছে কিচ্ছু জানবার উপায় নেই। আমি শুধু দেখছি যে বাঘ ওখানে নেই। হতে পারে এতক্ষণ ও মরে গিয়েছে, হতে পারে গুলী ভালভাবে লাগেনি, ওটা অনেক দূর চলে গিয়েছে, আবার এও হতে পারে যে কিছুটা আহত হয়ে ও কাছেই কোথাও বসে

আছে। বিপদ হচ্ছে যদি এই শেষটা হয়ে থাকে। তা হলে গাছ থেকে নামাই চলবে না। এ অবস্থায় নামা যেতে পারে এক যদি হাতী আনতে পারা যায় গাছের নিচে আর নইলে যদি অনেক লোকজন যথেষ্ট আগুন নিয়ে গাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। সেবার সঙ্গে হাতি ছিল না।

এ অবস্থায় যেটা করা নিরাপদ তাই করা ঠিক করলাম অর্থাৎ গাছেই রাত কাটানো। গাছের ডালেই যতদূর আরাম করে বসা যায়, তাই বসে গল্প করতে আরম্ভ করলাম। তারপর আস্তে আস্তে আরম্ভ হ'ল শীত।

যারা বলেন বাংলা দেশে বেশী শীত পড়ে না তাদের আমি সাদর আমন্ত্রণ করছি আমার সঙ্গে পৌষ মাঘ মাসে শিকারে যেতে। বেশী নয়, ঘণ্টা দুই তিনের জন্য মাচানে বসিয়ে দেব। এতক্ষণ শিকারের উত্তেজনায় এতটা অনুভব করিনি। এইবার আরম্ভ হ'ল। সারারাত গাছে কাটাবার জন্য তৈরী হয়েই গিছলাম, কিন্তু বাপরে বাপ। ইচ্ছা করছিল গায়ের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেই। পিটু বলল, সেলিম, আমার পা দু'টো দ্যাখ একবার। দেখি ওর হাঁটু দু'টো ঠক্ ঠক্ করছে, হাত দিয়ে দেখলাম থামানো মুশকিল। গাছের ওপর এক হৈ চৈ ব্যাপার। লক্ষ্য করেছি শীতে কাবু হলে মানুষ কথা বলে বেশী। সে রাত্রে Classical বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা গুণ আবিষ্কার করলাম– শরীর গরম রাখে। আনোয়ার সঙ্গীতে পারদর্শী নয় বলে ও চেষ্টা ছেড়ে সুরা ক্বেরায়াত করতে আরম্ভ করল। অবাক হয়ে গেলাম। ও যে অতগুলো সুরা জানে কোনদিন টের পাইনি। চা ফুরিয়ে গেছে– এক সম্বল সিগারেট।

এই চলল ঘণ্টা খানেক। এরপর অর্ধেকখানি চাঁদ উঠল আস্তে আস্তে। হঠাৎ মনে হ'ল মানুষের সাড়া পাচ্ছি যেন। কান খাড়া করে শুনে দেখি ঠিক তাই, পেছনের টিলাটার ওপাশে লোক জনের সাড়া। ওসমানকে বললাম, 'কু' দাও।

এই 'কু' হ'ল পাহাড় বন অঞ্চলের বাসিন্দাদের টেলিফোন। লম্বা টানা একটা তীক্ষ্ণ কু উ উ উ। শেষের দিকটায় খুব উচ্চ গ্রামে উঠে হঠাৎ থেমে যায়। পাহাড়ে আর বনের গাছে প্রতিধ্বনিত হতে হতে এই 'কু' দু'মাইলেরও বেশী চলে যায়, বিশেষ করে রাত্রে।

ওসমানের 'কু'-এর উত্তরে ওপাশ থেকেও 'কু' ভেসে এল। তারপরই দেখি বনের ভেতর দিয়ে সার বেধে মশাল আসছে। ইয়ারমুকের ঘোর যুদ্ধ যখন টলটলায়মান (ওয়াটারলুর তুলনা কেন দেব) তখন সসৈন্যে খালেদের (রা:) আগমনে আবু ওবায়দার (রা:) মনে কতখানি আনন্দ হয়েছিল জানি না, কিন্তু আমি সে রাত্রে সেই আগুন আর শ'খানেক লোকের আগমনে কম উৎফুল্ল হইনি। বেশ দূরে থাকতেই

ওদের নির্দেশ দিলাম কোন দিক দিয়ে গাছের কাছে আসতে হবে– অর্থাৎ যে দিকটায় বাঘ ছিল তার ঠিক উল্টো দিক দিয়ে।

গাছ থেকে নেমে প্রথমেই খানিকটা আগুন তাপিয়ে নিলাম। তারপর মশালওয়ালা লোকগুলোকে পেছনে রেখে তিন তিনটা রায়ফেল আর বন্দুক বাগিয়ে চললাম বাঘের পানে– মানে বাঘ যেখানটায় ছিল সেদিক পানে। মশালের আলো বেশ খানিকটা দেখাচ্ছিল- টর্চ তো আছেই। পৌঁছে দেখি কিছু নাই। বনের ভেতরে না গিয়ে বাইরেটা খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে গেলাম। প্রায় গজ পঞ্চাশেক দূরে পড়ে আছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল– মরেনি মরেনি নড়ছে’ মনে পড়ল বড় বড় শিকারীদের Maxim- Do not believe a Leopard dead untill it is skinned–চামড়া না ছাড়ানো পর্যন্ত কখনো বিশ্বাস করো না যে লেপার্ড সত্যি মরেছে। কাজেই ওখান থেকেই আর একটি গুলী বসালাম। এইবার নিশ্চিন্ত।

কাছে গিয়ে দেখলাম যেখানটায় নিশানা করেছিলাম, হাতের পেছনে হৃৎপিণ্ডের ওপর, ঠিক– মানে Exactly সেখানেই লেগেছে। হৃৎপিণ্ড তো চুরমার হয়ে গেছেই উল্টো দিকে যেখান দিয়ে গুলীটা বের হয়ে গেছে সেখান থেকে ফুসফুসের একটা টুকরা ঝুলছে। এই নিয়েই ও এতদূর এসেছে। আর কয়েক গজ গেলেই গভীর বনে ঢুকে পড়ত আর সে রাত্রে অন্ততঃ ওকে পেতাম না।

রতনপুরে শিকার করা চিতা বাঘের সাথে আমি।

আরো একটি ঘটনায় অনুরূপ ব্যাপার দেখলাম। যমুনার চরে একটি বিশালকায় বন্য শুকরকে লক্ষ্য করে গুলী করেছিলাম। শুকরটা ছিল আমার থেকে ৫০/৬০ গজ দূরে। সেদিন আমার হাতে ছিল Explora নামের ১২ বোরের দোনলা বন্দুক। বন্দুকটির বৈশিষ্ট্য একটু বলা দরকার। বন্দুকটা ১২ বোরের দোনলা বন্দুক হলেও এর নলের সম্মুখভাগের শেষ ছয় ইঞ্চি রায়ফেলিং করা। বন্দুকের কার্তুজ (Cartridge) পেতলের; বুলেটের ওজন ৭৩০ গ্রেন (Grain)। এই কার্তুজ ১২ বোরের বন্দুকের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী। ঝাড়ুর (Beat) তাড়া খেয়ে শুকরটা জঙ্গল থেকে বের হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল আমার আড়াআড়ি হয়ে। আমি চিরাচরিতভাবে ওর বুক লক্ষ্য করে গুলী করলাম, অর্থাৎ Heart shot। গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে শুকরটা আমার দিকে ঘুরে প্রচণ্ড বেগে দৌড় দিল। প্রথম মুহূর্তে মনে করলাম গুলী ওর গায়ে লাগেনি অর্থাৎ আমি গরংং করেছি এবং শুকরটা আমাকে আক্রমণ করার জন্য তেড়ে আসছে। তখন আমার দ্বিতীয় নলে (Barrel) একটি মাত্র গুলী আছে। তখন আর বন্দুক খুলে খালি কার্তুজ ফেলে নতুন গুলী ভরার সময় নেই। কাজেই আমি স্থির করলাম ওটা যখন আমার কাছে এসে পড়বে তখন আমি গুলী করব। কারণ ওটা দূরে থাকতে যদি আমি গুলী করি আর সেটা যদি Miss হয় তবে খালি বন্দুক হাতে আমি অসহায় হয়ে পড়ব। কাজেই বন্দুকের লক্ষ্য ওর উপর স্থির রেখে আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু শুকরটা ২৫/৩০ গজ অগ্রসর হতেই আমি বুঝলাম যে না, আমি ওর লক্ষ্য নই। কারণ আমাকে কিছুটা বাঁ দিকে রেখে ও মাঠের উপর দিয়ে দৌঁড়ে যাচ্ছে। ওটা যখন আমার থেকে গজ পঁচিশেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি আমার দ্বিতীয় গুলীটি মারলাম। আমার বন্দুকের ৩০০ গজের Left back side-টি ঢিলা ছিল, প্রথম গুলীটি করার সময় গুলির ঝাঁকিতে ঐ ঢিলা Left side-টি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল। কাজেই ঠিকমত নিশানা করতে না পেরে আন্দাজেই গুলী করলাম এবং গরংং করলাম। দুটো গুলীই শেষ হয়ে যাওয়ায় আর গুলী করতে পারলাম না এবং শুকরটি মাঠের উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। ২৫ গজ দূর দিয়ে দৌঁড়ে যাওয়ার সময় আমি দেখতে পেলাম আমি প্রথম গুলীটি যে জায়গায় নিশানা করে করেছিলাম ঠিক সেই জায়গায় লেগেছে এবং ২৫/৩০ গজ দূর থেকেও ১২ বোরের গুলী ঢোকার বিরাট ছিদ্র দেখতে পাচ্ছিলাম। মাঠের উপর দূর থেকে গুলী করার জন্য ১২ বোরের বন্দুক উপযুক্ত নয় বলে আমার দ্বিতীয় বন্দুক বাহকের কাছে আমার খালি বন্দুকটি দিয়ে তার কাছ থেকে High power ২.২ বোরের রায়ফেলটি

নিয়ে মাঠের উপর দিয়ে শুকরের পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। বিরাট মাঠের শেষ প্রান্তে গভীর জঙ্গলটাই ছিল তার লক্ষ্য। আমার ওর পিছনে দৌড়াবার কারণ ছিল এই যে নিখুঁত Heart shot নিয়ে কোন প্রাণীর পক্ষে এই বিরাট মাঠ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ দৌঁড়াবার পরেই লক্ষ্য করলাম ওর গতি কমে আসছে। খানিকক্ষণ পরে শুকরটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং একটু ঘুরে আমাকে দেখতে লাগল। তখন শুকরটা আমার থেকে ৬০/৭০ গজ দূর হবে। হাঁপাচ্ছিলাম বলে এতদূর থেকে লক্ষ্য স্থির করা মুশকিল হওয়ায় আমি হাঁটু গেড়ে বসে লক্ষ্য স্থির করে গুলী করলাম। ওটা সঙ্গে সঙ্গে আবার দৌঁড় দিল। আমিও উঠে আবার ওর পিছন পিছন দৌঁড়াতে লাগলাম। পরে দেখেছিলাম যে গুলীটি ওর বাঁ পায়ের গোড়ায় লেগে ওর শরীরের ভিতর দিয়ে ডান কণ্ঠ পর্যন্ত গিয়েছিল। এবার ওর গতি ক্রমশই কমে আসছে আর আমাদের দূরত্বও কমছে। আমি যখন ওর থেকে ১৫/২০ গজ দূরে এসে গেছি তখন ওটা আবার দাঁড়াল এবং বাঁ দিকে একটু ঘুরে আমাকে দেখতে লাগল। এবার আমি থামলাম না, শুধু দৌঁড়ান ছেড়ে ওর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। আমি জানি ও আর দৌঁড়াতে পারছে না। বেশী কাছে গেলেই আমাকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। সেজন্য আমি একেবারে তৈরী হয়ে যখন শুকরটা থেকে ৫/৭ গজ দূরে তখন ও প্রচণ্ড একটা গ্যাক্ শব্দ করে আমার দিকে ঘুরল ও ঘোরা সম্পূর্ণ আমার দিকে হওয়ার আগেই আমি ওর ঘাড় লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লাম। তখন শুকরটা ডান পাশে পড়ে গেল। এবং খানিকক্ষণ হাত পা ছুড়ে মরে গেল। আমার খুব কৌতুহল হ'ল যে Heart shot খেয়েও এই শুকরটা কেমন করে প্রায় ৪০০ গজ দূরে গেল। কাজেই পরদিন ওটাকে কাটালাম। দেখলাম ৭৩০ গ্রেইন ওজনের বুলেটটা ওটার হৃৎপিণ্ড (Heart), ফুসফুস (Lungs) চুরমার করে দিয়েছে। আমার মনে হয় পৃথিবীতে আর কোন জন্তু নেই যে এই জখম নিয়ে শুধু যে এতদূর দৌঁড়ে যেতে পেরেছে তাই নয় আবার আমাকে আক্রমণ করারও চেষ্টা করেছে। লেপার্ডের প্রাণও অত্যন্ত শক্ত, যে জন্য শিকারীদের মধ্যে প্রবাদ বাক্য হয়ে গিয়েছে Don't believe a leopard is dead untill it is skinned অর্থাৎ একটা চিতা বাঘকে চামড়া না ছাড়ানো পর্যন্ত বিশ্বাস করো না যে সেটা মারা গিয়েছে। কিন্তু অনেক বাঘ, শুকর এবং অন্যান্য জন্তু শিকারের পর আমি মনে করি যে সমস্ত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রাণ বন্য শুকরের।

সামনের ‘সাদা আর সবুজ’ অধ্যায়ে যে বাঘটি শিকারের কথা লিখেছি সেটাকেও গুলী করেছিলাম এই Explora বন্দুক দিয়েই। সেই একই ৭৩০ গ্রেইন ওজন বুলেটের আঘাত নিয়ে ঐ বাঘটা ৫০ গজের বেশী যেতে পারে নাই। কিন্তু এই শুকরটা প্রায় ৪০০ গজ দৌঁড়ে গেছে এবং রায়ফেলের আরো একটি গুলীর পরও আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করেছে। তাই বলছিলাম বন্য শুকরের প্রাণ বাঘের চেয়েও কঠিন।

এই ঘটনার পর আরও কয়েকবার প্রায় একই রকম ব্যাপার ঘটল। ঐ হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে মারি–লাগেও ঠিকই– কিন্তু শিকার থাকে না ঐ খানেই। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম অন্য কোথাও মেরে দেখব। বাঘের ওপর সাহস পেলাম না, প্রথম পরীক্ষা বা Experiment করলাম বিরাটকায় একটা শুয়োরের ওপর।

শিকারকে শিকারের জায়গাতেই আটকে রাখার জন্য Shoulder shot অর্থাৎ কাঁধ এবং ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গা তার অনেক উদাহরণের মধ্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও, তেতুলিয়া, পঞ্চগড় এলাকায় শিকারে গিয়েছিলাম। অনেকদিন আগের ঘটনা তাই ঠিক মনে পড়ছে না ঠিক কোন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছিল। জঙ্গল ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছিল। আমি জঙ্গলের অপর পাশে ছয় সাত ফিট উঁচুতে একটা কাঁঠাল গাছের ডালে বসেছিলাম। যে জঙ্গলটাতে ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছিল সেটা এবং আমার গাছের মাঝে ছিল খোলা মাঠ। একটু পরেই মোটামুটি বড় সাইজের একটা শুকর জঙ্গল থেকে বের হয়ে মাঝারি গতিতে মাঠের ওপর দিয়ে পিছনের জঙ্গলের দিকে যেতে লাগল। সেদিন আমার হাতে ছিল .২৭৫ (7 m/m) বোরের রায়ফেল। এর বুলেটের ওজন মাত্র ১৭০ গ্রেইন এবং শক্তি (Energy) Explora এর চাইতে অনেক কম। ওটা যখন আমার থেকে গজ ত্রিশেক দূরে তখন ওর কাঁধ লক্ষ্য করে গুলী করলাম। গুলীর সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুরে পড়ে গেল। এক হাতও এগুতে পারল না। আমি লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে রায়ফেলটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে কোমর থেকে পিস্তলটা বের কোরে নিয়ে ওটার কাছে গিয়ে দেখি মরে গেছে। এই তিনটি ঘটনাই প্রমাণ করে হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে গুলী (Heart shot) এর চেয়ে কাঁধ লক্ষ্য করে গুলী (Shoulder shot) অনেক কার্যকরী অন্ততঃ আহত জন্তুকে অনুসরণ করে গভীর জঙ্গলে ঢোকার চেয়ে অনেক ভাল।

যাই হোক, ভাল করে এই শুয়োরটার ওপর গুলীর কাজ বা Action লক্ষ্য করে নিশ্চিন্ত হলাম যে হৃৎপিণ্ডতে মারার চাইতে এটা নিশ্চয়ই বেশী মারাত্মক। তারপর বাঘেরও ঐখানে মেরে দেখেছি। এখন তো আমি ওখানে ছাড়া মারিই না।

মনে আছে এই নিয়ে আব্বার সঙ্গে তুমুল তর্ক হয়েছিল শিকার থেকে ক্যাম্পে ফেরার পর। তাঁর ঐ প্রচলিত Heart-shot-এর দিকে ঝোঁক। শেষে বললেন ‘বেশ, হাতে কলমেই দেখা যাক।’ বললাম–‘চলুন’। একটা সাধারণ .২২ বোরের রায়ফেল নিয়ে বের হলাম।

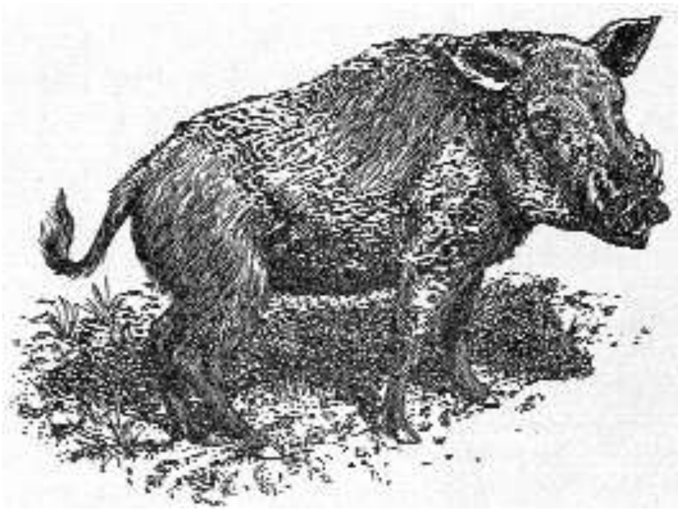

অন্ধকার রাত। কিছু দূরেই দেখি একটা শেয়াল মাঠের মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে কী খাচ্ছে। বললাম–‘মারুন, ঠিক হাতের সামনে’। গুলীর সঙ্গে সঙ্গে শেয়ালটার মাথাটা মাটিতে পড়ে গেল যেখানে ছিল ওখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ল না। আব্বাও জানেন, আমিও জানি যে Heart-shot-এ ও অন্ততঃ দু'টো লাফ দিত। কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে শেয়ালটাকে উল্টে পাল্টে দেখে আব্বা বললেন– ‘বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক’। তারপর তিনি বাঘকেও ওখানে মেরে দেখেছেন। এখন আব্বাও ওই shot-এর ভক্ত।

তবে এইখানে একটা কথা আমার বলে রাখা দরকার। আমার থিওরীর পক্ষে আমি এখনও কোন বড় শিকারীর সমর্থন পাইনি। জীম করবেট থেকে শুরু করে আফ্রিকার White Hunter-দের অতি আধুনিক বইয়েও সেই প্রচলিত হৃৎপিণ্ডের গুলীর সমর্থন রয়েছে। আর আমার মতে এই গুলীর জন্য– যাকে আমি বলি Shoulder shot বা কাঁধে গুলী– রায়ফেলের হাত খুব পাকা হওয়া চাই, আর রায়ফেলটা শিকার অনুপাতে বেশ শক্তিশালী হওয়া দরকার। কারণ আছে। প্রথমতঃ Heart-shot-এ হৃৎপিণ্ডতে

পৌঁছতে গুলীটাকে খুব বেশী Muscle বা মাংসপেশী ভেদ করতে হয় না। কিন্তু কাঁধে ওকে অনেক বেশী পেশী (Muscle) ভেদ করতে হয়। আর তারপরও ভেতরে ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গতে হয়। দ্বিতীয়, যদি গুলী ঠিক জায়গায় না লেগে একটু সরে কাঁধের হাড়ে লাগে, যাকে Shoulder Blade বলে এবং সেটাকে ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গতে না পারে তবে শিকার শুধু এক পায়ে খোঁড়া হবে, তখন পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। এক ধরনের আনাড়ী শিকারী আছে যারা শিকারের মাথা লক্ষ্য করে গুলী করে। এর মত Risky অনিশ্চিত গুলী আর নেই। নিরুপায় না হলে অর্থাৎ সোজাসুজী আক্রমণ না করলে কখনও মাথায় মারতে নেই।

এই যে গুলীর কথাগুলো বললাম– Heart shot, Shoulder shot ইত্যাদি এগুলো কিন্তু হাতির সম্বন্ধে খাটবে না। হাতীকে কোথায় মারতে হয় সে সম্বন্ধে শিকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে প্রচুর। মাথায়, কপালের উঁচু জায়গাটায়, কাঁধের পেছনে, হৃৎপিণ্ডতেও, এমন কি একজন শিকারী মুখের মধ্যে দিয়ে তালুতে গুলী করার পক্ষপাতি। এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই। অত্যন্ত সহজ কারণ– আমি হাতী মারিনি।

শিকারের বাংলোয় মধ্যাহ্নভোজ

পাঁচ

ক্যামোফ্লেজ

বাঘ লেপার্ড আর অন্যান্য বন্যজন্তুদের লুকোবার বা নিজেদের Camouflage করার ক্ষমতা সম্বন্ধে যাদের ভাল ধারণা নেই, তাদের শিকার থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয় বেশী– আর তাদের নিজেদের বিপদের সম্ভাবনাও বেশী। এই Camouflage-এর শক্তি আল্লাহ্ই তাদের দিয়ে দিয়েছেন। একটা ছোট ঘাসের গোছা বা সামান্য উঁচু মাটির ঢিঁপির আড়ালে একটা সাড়ে-নয় ফিট বাঘ এমন করে লুকাবে যে পরে যখন সেই ঘাসটা বা ঢিঁপিটা দেখবেন তখন বিশ্বাসই করতে চাইবেন না যে এরই পিছনে এত বড় বাঘটা লুকিয়ে ছিল।

আপনারা নিশ্চয়ই অনেক সময় দেখেছেন যে গাছের পাতায় একটা পোকা বা প্রজাপতি বসে আছে আর তার রংটা পাতার রংয়ের সঙ্গে এমন করে মিশে গেছে যে ভাল করে লক্ষ্য না করলে ওটাকে পোকা বলে বোঝাই যায় না। মনে হয় ওটাও গাছেরই একটা অংশ। এই হ'ল Camouflage.

একবার একটা প্রজাপতি দেখেছিলাম, তার ডানা দু'টো যেন ঠিক দু'টো গাছের পাতা। ঠিক পাতার মত আর তেমনি মাঝখান দিয়ে একটা করে লম্বা শির, আর তার থেকে ছোট ছোট শির বেরিয়েছে। একটা ডানা যদি ছিঁড়ে ওর গা থেকে উঠিয়ে নেয়া যায় তবে সেটাকে গাছের একটা পাতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

জন্তু-জানোয়ারদেরও এমনি Camouflage করার ক্ষমতা আছে। ছোট পোকা-মাকড়ের রং যেমন দেখলেই বোঝা যায় যে এটাতো Camouflage করারই উপযুক্ত, জন্তু-জানোয়ারদের সবগুলোর তা নয়। কতকগুলোর ওমনিই আছে, যেমন ধরুন সিংহ। গায়ের রং ব্রাউন। ওর যেখানে বাস আর চলাফেরা অর্থাৎ আফ্রিকার Veldt সেখানটা খানিকটা মরুভূমির মত; সেখানকার মাটির রং আর ব্রাউন রংয়ের পোড়া পোড়া ঝোপঝাড়ের সঙ্গে ওর রং খুব সুন্দর মিলে যায়। আবার দু'চারটা জানোয়ার আছে যাদের দেখলে মনে হয় এদের গায়ের রংয়ের উদ্দেশ্য Camouflage নয়––সৌন্দর্য্য। ভাবাটা খুব ভুল হবে না। তবে ঐ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে Camouflage-টাও দিতে আল্লাহ্ ভুল করেননি।

উদাহরণ, মনে করুন বাঘ কিম্বা লেপার্ড; পৃথিবীর সুন্দরতম জানোয়ারদের দু'টি। প্রথমে মনে হবে এই উজ্জ্বল হল্‌দে রংয়ের উপর এমন কালো ডোরা বা ফুল--এতো দু'শো তিনশো গজ দূর থেকে চোখে ঠিক্‌রে এসে লাগবে--এ Camouflage করবে কি করে?

কিন্তু ভুল। শিকারীদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে ওদের লুকোবার ক্ষমতা অন্য জানোয়ারদের চেয়ে বেশী বই কম নয়। বাঘের গায়ের কালো ডোরা নলখাগড়া, লম্বা উঁচু ঘাস যাকে বলে Elephant grass, গোলপাতা, এগুলোতে, আর লেপার্ডের গোল গোল ফুল ছিটের জঙ্গলে শাল-গজারির কপিসে এবং সাধারণ সবরকম ঝোপ-ঝাড়ে সুন্দর মিলে যায়। এই জন্যেই দেখবেন বাঘ ঐ রকম নলের জঙ্গলে আর লেপার্ড ঝোপ-ঝাড়ে বেশী থাকে। আশ্চর্য ওরা কেমন করে বোঝে কোথায় ওদের Camouflage ভাল হবে!

একবার একটা ছোট্ট মথ্‌ (Moth) পোকাকে দেখেছিলাম Camouflage করতে। দেখি ওটা সাদা দেয়ালের গায়ে একবার বসছে পরক্ষণেই সেখান থেকে উড়ে আবার অন্য কোথায় বসছে। কিন্তু থাকছে না– আবার উড়ে অন্য যায়গায় বসছে। চেয়ে রইলাম। এমনি অনেকবার বসবার আর উড়বার পর হঠাৎ একবার বসল দেয়ালের এমন এক জায়গায় যেখানটার চুনকাম উঠে গিয়ে নিচের হালকা লাল্‌চে রংয়ের আস্তর বেরিয়ে পড়েছে। দেখলাম মথ্‌ (Moth)-টার গায়ের রংয়ের সঙ্গে দেয়ালের রংটা বেশ মিশে গেছে– ওকে দেখতে চাইলে একটু লক্ষ্য করতে হয়। এইবার আর ওটা উড়ল না– নড়ে চড়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল। কে ওকে বলে দিল কোথায় ওর রং মিলছে?

যাক্‌ যা বলছিলাম--শিকারের Camouflage এর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা শিকারীর পক্ষে অপরিহার্য। এর অভাবে সাধারণভাবে শিকারের দেখাই মিলবে না, আর যদি আহত শিকারকে রক্তের দাগ ধরে অনুসরণ করতে হয় তবে তো কথাই নেই---জানও যেতে পারে।

ছয়

সাদা আর সবুজ

একটা জিনিসে এই Camouflage সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। সেটা হচ্ছে কাপড়। সবাই খাকী ব্যবহার করেন। কিন্তু এর মধ্যেও একটু কথা আছে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় এমন কি বিহারের ঐ দিকটা থেকে সমস্ত ভারতময়ই খাকী ঠিক আছে। কারণ ও দিকটার বনগুলো অনেকটা ফাঁকা অর্থাৎ গাছের লতা পাতা– যাকে বলে Foliage এবং ঘন ঝোপ-ঝাড় অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু Tropical জঙ্গলগুলোর– যেমন পূর্ব-পাকিস্তান, বার্মা, মালয়, দক্ষিণ-আমেরিকার আমাজন অঞ্চলে এই লতা-পাতা এত ঘন ও সবুজ যে আসল গাছগুলো প্রায় দেখাই যায় না। এখানে খাকীর চেয়ে গাঢ় সবুজ রং যাকে অনেকে Bottle Green বলেন– এটা বেশী Camouflage করে। অবশ্য মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন এদিককার বনের পাতা পড়ে যায় বা পুড়ে যায়, তখন খাকী মন্দ চলে না।

কাপড়ের রং-এর সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে শরীরে যেন কোথাও এক টুকরা সাদা রংয়ের কিছু না থাকে। বাধ্য হয়ে যদি সাদা বা হাল্‌কা রং-এর মোজা পরতে হয়, তবে ট্রাউযার দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেবেন। রুমাল সাদা হলে একদম পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন, যাতে কোণাটাও দেখা না যায়।

এর বিশেষ কারণ আছে। জন্তু-জানোয়াররা Color blind; আমরা যেমন সব রং দেখতে পাই ওরা তা দেখে না। শুধু সাদা আর কালোর বিভিন্ন ঝযধফব বা মিশ্রণ দেখে। কথাটা হয়ত অনেকের কাছে পরিষ্কার হ’ল না। আপনারা নিশ্চয়ই সাধারণ ফটো দেখেছেন–সিনেমাও দেখেছেন; আর রঙ্গিন ফটো আর সিনেমাও দেখেছেন। জন্তু-জানোয়াররা যা কিছু দেখে ঐ সাধারণ ফটো আর সিনেমার মত করে--দেখে

সবই কিন্তু সব সাদা আর কালো– Black and white ev Light and shade, আর আমরা মানুষেরা সবকিছু দেখি যেটার যে রং সেই রংসুদ্ধ– ঐ রঙ্গিন ফটো বা সিনেমার মত করে। অবশ্য মানুষের মধ্যেও Color blind আছে তবে সম্পূর্ণ নয়। কাজেই সাদা যে কোন জিনিসে জন্তু-জানোয়ারের চোখ পড়ে চট্‌ করে। তাই এই সাবধানতা। শিকারে সাদা রং নিয়ে একটা ঘটনা শুনুন। অতি অল্পের জন্য বিপদ ঘটেনি।

শিকারের সন্ধানে লোক লাগিয়েই রেখেছিলাম। সন্ধ্যার পর একজন ফরেস্ট গার্ড এসে খবর দিল একটি জঙ্গলে বাঘ দেখে এসেছে; গার্ডটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ফরেস্টার নিজেই। এই ফরেস্টারকে আমি ভুলব না। এর আসল নাম আমার মনে নেই– জানতাম বাচ্চু মিয়া বলে। খুব রোগা পাতলা লোকটা, কিন্তু শিকারে ভীষণ উৎসাহ, সহজে হয়রান হতেন না। আর ছিল ওর এক জোড়া চোখ। সত্যি কিছুই তার চোখে এড়াতো না। মাঝে মাঝে আমাকেও হার মানিয়ে দিতেন। যাই হোক–রাত্রেই Beater বা ঝাড়ুদারদের খবর দিলাম তৈরী থাকতে।

পরদিন সকালে রওয়ানা হয়ে ক্যাম্প থেকে কিছুদূর গেছি। পেছনে অনেক লোক। কি কথা বলতে গিয়ে পেছন ফিরেছি– দেখি লোকজনের মধ্যে অপরিচিত একজন ভদ্রলোক--পরনে ধোপদুরস্ত সাদা পায়জামা আর সাদা শার্ট। প্রশ্ন করলাম, ‘ইনি কে?’ বাচ্চু মিয়া বললেন, ‘স্যার, গভর্নমেন্ট যে খাল কাটাচ্ছেন Irrigation-এর জন্য, ইনি তার কন্ট্রাকটার। তার শিকার দেখার খুব শখ হয়েছে। আমিই বলেছি আসতে।’ বললাম– ‘আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এ কাপড়ে আমি আসতে দেব কি করে, তারই তো বিপদের সম্ভাবনা।’ বাচ্চু মিয়া ধরে বসলেন– ‘স্যার– আসতে দিন, ওকে বাইরে বাইরে রাখব।’ অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সবগুলো ঝাড়ুতে তাকে একটু বাইরের দিকে– নিরাপদ যায়গায় রাখলাম। বাচ্চু মিয়া আমার সঙ্গেই রইলেন।

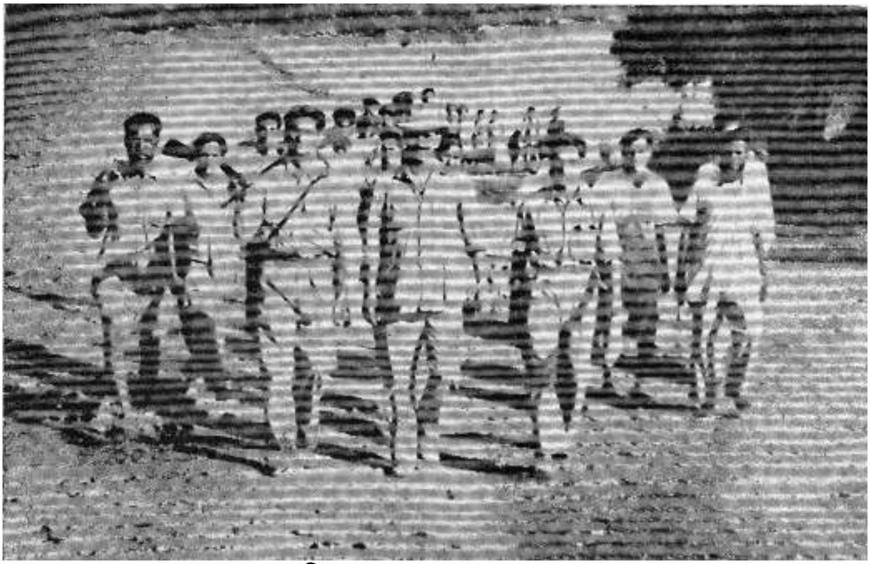

শিকারে চোলেছেন আব্বা

সারাদিন ঝাড়ুর পর বাঘ না পেয়ে ক্যাম্পের দিকে ফিরছি। ঝাড়ুদারদের সব বিদায় দিয়েছি। শুধু ১০-১৫ জন লোক যাদের বাড়ী এই দিকে তারাই সঙ্গে আসছিল; মেজাজটা অত্যন্ত তিরিক্ষে। দু-দু'টো বাঘ আমার কাছ থেকে মাত্র পনের গজ দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এত ঘন জঙ্গল ছিল যে শত চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। সঙ্গের লোকজনের মধ্যেও কোন কথাবার্তা নেই। একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছি, ঝাড়ুদারদের ৩-৪ জন এসে বলল, 'হুজুর। এই জঙ্গলটাও দেখে যাই।' তাকিয়ে দেখলাম– বেশ বড় বন। লম্বায় প্রায় আধ মাইলের মত হবে--চওড়াও কম নয়। বললাম, 'এত বড় বন, তোমরা এই কয়জনে কী করবে?' ওরা বলল, 'তা ঠিক। তবু এখান দিয়েই যখন যাচ্ছি তখন না হয় বনের ভিতর দিয়ে হেঁটেই যাই। আপনি শুধু ও পাশটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন।' জানি কোন লাভ নেই, তবু ওদের উৎসাহ দেখে বললাম, 'যাও– দাঁড়াচ্ছি।'

শিকারী বেশে আমার বাবা

বনটার শেষপ্রান্তে গিয়ে দেখলাম বনের বড় গাছগুলো টিলার ওপর দিকেই শেষ হয়েছে। তারপর টিলার ঢালু গা বেয়ে নেমে এসেছে ঝোপ ঝাড়, মাঝে কোন বিরতি নেই, শুধু এই ঝোপগুলোর মধ্যে মধ্যে খানিকটা ফাঁক; টিলার ঢালু গায়ের মাঝামাঝি জায়গায়– একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো ঠিক করলাম। পেছনে ঢালুটা আরও নিচের দিকে চলে গেছে, তারপর আবার ওপর দিকে উঠে ক্রমশঃ ওধারের টিলাটার গায়ে উঠেছে। দাঁড়াতে গিয়ে দেখি––সেই ভদ্রলোক। গাঢ় সবুজ বনের পটভূমিকায় এখন এত বেশী সাদা দেখাচ্ছে যে বাঘ ওকে দেখলে নিশ্চয়ই লজ্জা পাবে। একটু মুশকিলেই পড়লাম। সব লোক ঝাড়ুতে চলে গেছে– কাছাকাছি কোথাও গাছ নেই। অবশ্য বাঘ বেরোবে না সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম– কিন্তু সাবধানের মার নেই। এক কাজ করলাম--ওকে আমার ঠিক পেছনে মাটিতে বসালাম; বাচ্চু মিয়াকে বললাম কয়েকটা পাতলা ডাল পাতাসুদ্ধ কেটে এনে একে ঢাকুন। আর ভদ্রলোককে বললাম– ‘বাঘ এসে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে আপনি এমন অদ্ভুতভাবে বসে আছেন কেন,

তবে কোন জবাব দেবেন না। যদি আপনার নাকও শুঁকে দ্যাখে তবুও একটু নড়বেন না।’

ডাল আর পাতা দিয়ে ওকে ভাল করে ঢেকে দিয়ে নিজেও বসে পড়লাম মাটিতে। সারা দিন Beat করে করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর রোদ্দুরে আমি এমনিতেই বড্ড কাবু। বসে দু’পায়ের মধ্যে বন্দুকটা ধরে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। বাচ্চু মিয়া বসলেন না। দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে রইলেন।

সিগারেটটা অর্ধেকও খাইনি। হঠাৎ বাচ্চু মিয়া নিচু হয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন– ‘কী যেন আসছে।’ ভাবলাম– কী আর হবে– বন-মোরগ, খরগোস বা হরিণ; বড় জোর শুয়োর। যারা ওপাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে তাদের কোন সাড়াই পেলাম না এখনও। তবু উঠে দাঁড়ালাম– অর্ধেকটা সিগারেট তখনও আঙ্গুলে ধরা। দেখলাম ঢালুর গা বেয়ে কোণাকোণিভাবে জঙ্গল নেড়ে কী যেন একটা বেশ দ্রুত চলে আসছে– আর আসছে ঠিক আমাদের সোজাসুজি। মোরগও নয়, খরগোসও নয়, জঙ্গল নড়া দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই ভাবতে ভাবতেই দু’তিন সেকেন্ডের মধ্যেই সব সন্দেহ মিটে গেল। চকিতে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখলাম– লেপার্ড।

কোথায় গেল শ্রান্তি আর ক্লান্তি। চট্ করে সিগারেটটা পেছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বন্দুক ধরলাম। বন্দুক তো ধরলাম; সেদিন আমার হাতে ১২ বোরের Explora বন্দুক, কিন্তু গুলী করব কাকে? বাঘের কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওর Position-টা বুঝতে পারছি। কারণ ও যেখান দিয়ে আসছে ঝোপঝাড় সব নড়ছে– কিন্তু তাতে তো আর গুলী করা চলে না। আর আমরা যে এখানে দাঁড়িয়ে তাতো আবার ও জানে না। ওতো সোজা আসতেই থাকবে আর আসতে আসতে আমার ২ ফিট সামনে ঝোপ থেকে যখন মাথা বের করবে তখনই প্রথম আমায় দেখবে তার আগে আর কোন উপায় নেই আমাকে দেখার বা আমার তাকে দেখার। দু’ফিট দূরত্বের ব্যবধানে তাড়া খাওয়া লেপার্ডের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখী হয়ে যাওয়ার অর্থ খুব সম্ভব দু’জনের একজনকে Happy hunting ground যাত্রা।

কিন্তু তখন আর উপায় নেই। সামনের ঝোপটার দিকে বন্দুকের নল রেখে সেফ্টি দিয়ে ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এসব লিখতে এতক্ষণ সময় লেগে যাচ্ছে; কিন্তু তখন কয়েক সেকেন্ড সময়ও পাই নি– কারণ প্রথম যখন বাঘটার একটুখানি দেখতে পেয়েছিলাম তখন বোধ হয় মাত্র গজ পঁচিশেক দূরে ছিল।

যাই হোক, দাঁড়িয়ে যখন বাঘের অপেক্ষা করছিলাম– তখন আমার বাঘের চাইতে

বেশী ভয় করছিল পেছনের লোকদের মনে করে। আমি তো অপেক্ষা করছি এই প্ল্যান (Plan) করে- যে মুহূর্তে বাঘের মাথা সামনের জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে আসবে– ঠিক সেই মুহূর্তে– ওর কিছু বুঝে উঠবার আগেই– বন্দুকের নল মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেপা। ঠিক সেই সময় যদি পেছন থেকে কোন বেফাস্ কিছু হয়ে যায় তবে তাদেরও সর্বনাশ, আর আমারও শিকার জীবনের ইতি।

মাত্র পাঁচ সেকেন্ড আগে বসে বিরক্ত হয়ে সিগারেট টানছিলাম, পাঁচ সেকেন্ড পরে হয়ত বেঁচে থাকব কিনা জানি না, এই হ'ল শিকারীর জীবনের স্বার্থকতা, কিন্তু কেউ কেউ হয়ত এরই মধ্যে শিকারীর মনের দরজার চাবি খুঁজে পাবেন।

আল্লাহর ইচ্ছা– তাড়াতাড়ির প্রয়োজন হ'ল না। এক সেকেন্ডের জন্যও চোখ অন্যদিকে ফেরাইনি। দেখলাম সোজা আসতে আসতে বাঘটা আমার দিক থেকে গজ দশেক দূরে থাকতে হঠাৎ একটু মোড় নিল। আমার বা দিকে ওর ডান দিকে। সমস্ত প্ল্যান এক মুহূর্তেই ওলট পালট হয়ে গেল। এতক্ষণ যে পথে আসছিল তা আসতে থাকলে এসে সোজা আমার ওপর পড়ত। এবার যে পথ ধরল যদি তা না বদলায়– আবার চট্ করে দেখে নিলাম– তবে আমার এখান থেকে গজ ছয় সাত দূর দিয়ে পেছন দিকে বের হয়ে যাবে। আরও দেখলাম যে এই সমস্ত পথ অতিক্রম করে ওদিকে টিলায় ওঠা পর্যন্ত কোথাও ওকে দেখা যাবে না একবার ছাড়া। আমার প্রায় পেছনে গজ তিন চার দূরে ঝোপের একটা ফাঁক। চওড়ায় ফিট চার পাঁচেক হবে। গুলী করবার এই একমাত্র জায়গা।

এখন আমার স্থির করতে হবে মোটেই গুলী করব কি না। ঐ সামান্য ফাঁকের মধ্যে নিশানা স্থির করে ঠিকমত গুলী করা– বিশেষ করে বাঘটা যখন ধীরে সুস্থে হেঁটে যাচ্ছে না, বেশ জোরেই যাচ্ছে– এটা যে কতখানি শক্ত কাজ তা প্রত্যেক শিকারীই বুঝতে পারবেন। আবার যদি গুলী না করে ওকে চলে যেতে দেই তবে শিকার ফস্কে যায় আর শিকারীর আত্মাভিমানে লাগে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলাম। ওই ফাঁকেই ওকে গুলী করব যা থাকে কপালে। এই যে মুহূর্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এটা শিকারী জীবনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। আজ হোক কাল হোক, প্রত্যেক শিকারীকে জীবনে বারে বারে এর মুখোমুখি হতে হবে। ভাববার সময় নেই, চারদিক দেখে চিন্তা করবার সময় নেই– ওরই মধ্যে মুহূর্ত পার হবার আগেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে আর সেই মোতাবেক কাজ করতে হবে। ইংরাজীতে একে বলা হয় Split second decision; সোজাসুজি অনুবাদ হ'ল

এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে সিদ্ধান্ত। আর এ সিদ্ধান্তে ভুল হলে আল্লাহ সে শিকারীকে সাহায্য করুন।

যাই হোক কি করব ঠিক করে নিয়ে ঘুরে পেছনে সেই ফাঁকটার দিকে বন্দুক নিশানা করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাঘটা সমান বেগে ওপর থেকে নেমে আসছে। এতক্ষণ ও ছিল ওপরে আমি নিচে– এই বার যখন ওই ফাঁকটায় বের হবে তখন আমিই একটু ওপরে আর ও একটু নিচে।

আমার সমস্ত অস্তিত্ব তখন উদগ্র হয়ে আছে। পেছনে বাচ্চু মিয়াকে ভুলে গেছি, পাতায় ঢাকা ভদ্রলোকটিকে ভুলে গেছি, পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ভুলে গেছি। আমার তখন একমাত্র চিন্তা ঐ ফাঁকটার মধ্যে আধ-সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে আমাকে ঠিকমত গুলী লাগাতে হবে। নইলে যা ঘটবে তা চিন্তা না করাই ভাল। বুকের মধ্যে যে দড়াম্ দড়াম্ করছে তাও শুনছি না।

লেপার্ডটা যখন ফাঁকটা প্রায় পার হয়ে গেছে তখন আমার গুলী পড়ল ওর গায়ে। যে সময়ের কথা বলছি তখন আমি Shoulder Shot আরম্ভ করেছি, যে Shoulder Shot-এর কথা আমি পিছনে বলে এসেছি। ওরই মধ্যে যতটুকু সম্ভব কাঁধ লক্ষ্য করেই মেরেছিলাম। লাগল না। বাঘের চলার সঙ্গে সঙ্গে নিশানা করতে বন্দুকটা যে সামান্য একটু Swing করতে হয়েছিল, ওতেই বাঁ দিকের একটা পাতলা ডালে বন্দুকের নল ঠেকে গিয়ে গুলীটা পড়ল একটু পেছনে, মানে বুকে, হৃৎপিণ্ডের ওপর। যা হবার তাই হ'ল, ওখানেই পড়ে যাবার বদলে গ্যাক্ করে গর্জন করে বাঘটা চার হাত পায়ে লাফিয়ে উঠল, একেবারে আশে পাশের ঝোপ ঝাড়গুলোর মাথা ছাড়িয়ে।

তারপরই যে কাণ্ডটা ঘটল তা ভাবতে গেলে আজও ঠাণ্ডা ঘাম বেরোয়। ওদিকে তো বাঘ লাফ দিয়ে উঠল আর ঠিক সেই সঙ্গে আমার বা দিক থেকে spring-কে টেনে ছেড়ে দিলে যেমন ছিটকে যায় তেমনি সমস্ত ডাল পাতা শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন সেই ভদ্রলোকটি।

ব্যাপার হয়েছে কি, ভদ্রলোকের কোন ধারণাই ছিল না যে বাঘ বেরিয়েছে। ওখানে বসে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে তিনি শুধু দেখলেন যে বাচ্চু মিয়া নিচু হয়ে আমায় কিছু বললেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম, একটু ওমনি দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বা দিকে ঘুরে কিছু একটা লক্ষ্য করে গুলী করলাম। কিন্তু ওটা যে একটা বাঘ এবং বেশ বড় সাইজের তা ধারণা করার কোন উপায়ই তার ছিল না। কিন্তু গুলীর সঙ্গে

সঙ্গে মাত্র ৩/৪ গজ দূর থেকে বাঘটা যখন হুংকার দিয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল তখন তিনি প্রথম টের পেলেন যে বসে বসে শিকার দেখাটাও সব সময় খুব নিরাপদ হয় না। ওকে মোটেই দোষ দেই না। ও অবস্থায় যে কেউ অমনি করতে পারত। তাছাড়া বেচারা যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে কিছু দেখা যায় না, আর বাচ্চু মিয়ার ফিস্ ফিস্ থেকে আমার গুলী করা পর্যন্ত দশ সেকেন্ড সময়ও পার হয়েছে কিনা সন্দেহ।

সে তো হ'ল। কিন্তু আমার অবস্থা এদিকে কাহিল। আমার সামনে শূন্যের উপর আহত বাঘ– তখনও জানি না গুলীটা কতখানি মারাত্মক হয়েছে, প্রকাণ্ড হাঁ করে রয়েছে; আর বাঁ দিকে ঝোপের ওপর দিয়ে বের হয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক, প্রায় মুখোমুখি। ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে সেই সাদা পায়জামা আর শার্ট মূর্তিমান, যাকে বলে Anticlimax.

বুঝলাম সর্বনাশ আসন্ন। এক সেকেন্ডেরও কম, তারপরই বাঘটা আবার নিচে ঝোপের মধ্যে পড়ল। ভাবলাম এইবার আসছে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী, মাটিতে পড়ে ও যেদিকে যাচ্ছিল ঐ দিকেই চলল আরও জোরে। লেপার্ডটা যখন ঐ দিকটায়, টিলার গা বেয়ে উঠছে তখন আবার ওকে দেখতে পেলাম দু'এক সেকেন্ডের জন্য। ওরই মধ্যে আমার দ্বিতীয় গুলীটা ছাড়লাম। বুঝলাম লাগল না। shot gun-এর পক্ষে অনেকটা দূর ছিল আর বাঘটা এদিক ওদিক টলছিল বেশ। তারপর বনে ঢুকে গেল।

ঝাড়ুদাররা এলে একটু অপেক্ষা করে রক্তের দাগ ধরে অনুসরণ করলাম, ও দিকটায় টিলায় উঠে সমতল জায়গাটাতেই পেলাম ওকে। ঠিক মাপটা মনে নেই, তবে সাত ফিটের একটু কম ছিল বলে মনে পড়ছে।

আমি আজও বলতে পারব না লেপার্ডটা সেই ভদ্রলোকটিকে দেখল না কি করে। একটা মাত্র কারণ মনে হয়; গুলীর প্রচণ্ড আঘাতে এক মুহূর্তের জন্য ঠিক যখন শূণ্যে লাফ দিয়ে উঠেছিল ও চোখে অন্ধকার দেখছিল তাই কিছু দেখতে পায়নি। নইলে না দেখাটা প্রায় অসম্ভব। ভদ্রলোকের নামটা মনে নেই; বাচ্চু মিয়াও এখন কোথায় আছেন জানি না; যদি এই বই তাদের হাতে পড়ে তবে তারা পুরোনো কথা মনে করে আনন্দ পাবেন।

আমার মারা একটি লেপার্ড

সাত

সংস্কারের জন্ম

শিকারে যারা অনেকবার গেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, আর যারা যাননি তাদের জন্য বলছি, আগে থেকে করা প্ল্যান অনুযায়ী সবকিছু সেখানে ঘটে না। কথাটা একটু খোলাসা করে বলছি।

একটা গতানুগতিক ব্যবহার নিয়েই বলছি। ধরুন, একটা মড়ি পেয়ে গেলেন। কাছে একটা সুবিধামত গাছও আছে। বাঘটা কোনদিক থেকে কোন রাস্তায় আসবে তারও একটা পরিষ্কার চিহ্ন আপনি পেয়ে গেলেন। তাহলে Theoritically ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল। ভাল করে মাচান বেঁধে বসে অপেক্ষা করুন। আর যদি আপনি নেহায়েৎ সাবধানী লোক হন তবে বাঘের আসার একটা রাস্তার উপর নির্ভর না করে যে কোন দিক দিয়ে আসলে যাতে আপনি কোন অসুবিধায় না পড়েন সে জন্য তৈরী হয়ে বসলেন। ভাবলেন, যদি এদিক থেকে আসে তবে মারতে পারব। যদি ওদিক থেকেও আসে তবে মারতে পারব, যদি পেছন থেকে মাচার নিচ দিয়ে আসে ক্ষতি নেই, বিশেষ অসুবিধা হবে না।

হতে পারে আপনার প্ল্যান অনুযায়ী বাঘ এল এবং ঠিক আপনি যা আশা করেছিলেন তাই-ই হ'ল অর্থাৎ এসে মড়ি খেতে আরম্ভ করল এবং আপনার এক গুলীতে লুটিয়ে পড়ল। আপনি বাঘ নিয়ে মহা-খুশী হয়ে বাড়ী ফিরলেন।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এ রকমটি হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয় শতকরা দশটির বেশী নয়। বাকী নব্বই বারই হবে এই যে আপনি যা যা অবস্থা হতে পারে বলে ভেবে রেখেছিলেন তার একটাও হ'ল না। আর পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করল যা আপনি চিন্তাই করেননি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও বলা ভাল। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, All sportsmen are supersticious অর্থাৎ সব শিকারীই কুসংস্কারগ্রস্থ। এখানে sportsmen শব্দটা শিকারীদেরকে বুঝিয়েছে। কথাটা নেহায়েৎ মিথ্যে নয়, যদি কুসংস্কার বলতে ভাগ্যে বিশ্বাস ধরে নিন। যারা নিজেরা শিকারী নন তারাও বড় বড় শিকারীদের বই পড়লে এটা লক্ষ্য না করে পারবেন না। একটা সাপ না মারা পর্যন্ত

জীম করবেট ভাবতেন ভাগ্য বিরূপ তার উপর। আমার মাথায় এটা ঢোকে খুব কম বয়সে, একটা শিকার উপলক্ষ্য করেই।

তখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনের হবে। সে সময়টা প্রায় প্রত্যেক বছর দু'টো বজরা বা Green Boat বোঝাই করে সমস্ত পরিবার মানে দাদা, দাদী, আম্মা, আব্বা, চাচ্চা আর ভাই বোনেরা বেড়াতে বের হতেন। বড় বজরাটা ছিল প্রকাণ্ড, জাহাজ বললে হয়। নাম ছিল তার সুলতান। দাদা, দাদী, আমি এবং অন্য ভাই বোনেরা ওটাতেই থাকতাম। অপেক্ষাকৃত ছোটটায় আব্বা, আম্মা আর ছোট ভাই বোনরা থাকতেন। ওটার নাম ছিল মাহবুবা। বেশ অনেক দিন বেড়ান হত। কোন কোন বার বর্ষা শেষ হলেও ফিরতেন না। মঙ্গননগর বলে একটা কাচারী আছে বন অঞ্চলে। সেখানে বোট বেঁধে শিকার করতেন। হাতীগুলোও তখন ওখানেই রাখা হত। আমার সবসময় সঙ্গে যাওয়া হত না, স্কুল ছিল।

এমনি একবার গেছি। একদিন সকালে কেমন একটা গণ্ডগোলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? শুনলাম, কুমীর উঠেছে।

কুমীর! কই?

দেখলাম অনেক দূরে নদীর উজান দিকে আব্বা আর চাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই দেখলাম আব্বা হাতের রায়ফেল তুলে নিশান করছেন নদীর অপর পাড়ের দিকে। পাহাড়ী নদী বেশী চওড়া নয়– বোধ হয় একশ' গজের কিছু বেশী হবে, কিন্তু গভীর। কিন্তু কি নিশান করছেন চেষ্টা করে কিছু দেখতে পেলাম না।

আমাদের বোট 'সুলতান'; এতে বসেই 'বাঘ-বন-বন্দুক' এর পাণ্ডুলিপি রচনা করি

এক সেকেন্ড, তারপর বন্দুকের ঝাঁকিতে আব্বা নড়ে উঠলেন আর ওধারের পাড় থেকে কালো, লম্বা কী একটা ছিট্‌কে দড়াম্‌ করে পানিতে পড়ল। বুঝলাম কুমীর।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল ভেতর গিয়ে ১২ বোরের একটা Shot Gun-এ দু'টো বুলেট ভরে বাইরে বজরার ডেকে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমরা নদীর ভাটিতে, আব্বা গুলী করলেন উজানে, যদি এদিক পানেই আসে।

বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, এই যে, এই যে কুমীর, দেখি ঠিক মাঝ নদী দিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে রেলিং-এর উপর একটা পা তুলে দিয়ে কোনমতে নিশান করে চোখ, কান বুজে ট্রিগার টিপে দিলাম। চোখ কান বোজার কারণ ছিল। ওই আমার জীবনের প্রথম বুলেট মারা। ওর আগে তবু ছর্‌রা ভরে পাখি মেরেছি, বুলেট বেশ ঝাঁকি দেয় বলে ভয় ছিল। যাই হোক কুমীরটা ঝুপ করে ডুবে গেল, গুলীটা লাগল কি লাগল না বুঝলাম না।

খানিকক্ষণ পরে আব্বা আর চাচ্চা এলেন। দু'জনের হাতেই .৪০৫ বোরের উইনচেস্টার রায়ফেল। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখান থেকে গুলী করলে কে?' ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি'।

জিজ্ঞেস করলেন, 'লেগেছে?' বললাম, 'জানি না।' আব্বা কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন আরো ভাটির দিকে খোঁজ করতে। খানিক পরই খবর এল কুমীরটা মাত্র আধ মাইল খানেক দূরে আবার ভেসে উঠেছে। আব্বা বললেন, 'চল।'

একটা ডিঙ্গী নিয়ে গিয়ে ওকে মারা হ'ল। আব্বা মারলেন গুলীটা। কিন্তু শিকার হ'ল আমার। শিকারের নিয়ম হচ্ছে যার গুলীতে প্রথম রক্ত বেরুবে শিকার তার। সে গুলীতে যদি শুধু মাত্র চামড়াটা কেটে যায় এবং তার পরে বহু কষ্ট করেও অন্য লোক সেটাকে মারে তবু শিকার ওই প্রথম শিকারীর। শুধু শর্ত হচ্ছে রক্ত বের হওয়া চাই। এটা শিকারীদের Unwritten Law। আমার গুলীটা লেগেছিল কুমীরের পেটের কাছে।

ফিরে আসছি। এবার উজান বেয়ে, তাই খুব আস্তে আস্তে এগুচ্ছি।

আব্বা বললেন, দু'টো গুলীর পরে আর কোথাও কাছাকাছি পানি থেকে কুমীরটা উঠত না যদি তোমার গুলীটা না লাগত। কুমীরের গায়ে কোথাও আঘাত লেগে রক্ত বের হলে সেখানে পানি লেগে জ্বালা করতে থাকে, তাই তখন ও বারে বারে ডাঙ্গায় ওঠে। সেই জন্যই ও ডাঙ্গায় উঠেছিল।

তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কুমীরটার মউত তোমার হাতে ছিল। যদি তকদীর বলে কিছু না থাকত আর তদবীরই একমাত্র জিনিস হত তাহলে ওর মরা উচিৎ ছিল আমার বা গাওসের হাতে। আমি আর তোমার চাচ্চাই তো ভোর থেকে ওকে মারবার জন্যে ঘুরছিলাম। তুমি তো কিছু করনি। শুধু বোটের (Boat- বজরা) ডেকে দাঁড়িয়েছিলে।

কথাটা কোনদিন ভুলিনি। তারপর বহুবার বহু ঘটনায় সে বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে।

১৪-১৫ বছর বয়সে আমার প্রথম শিকার (কুমির)

আট

ক্যাম্পফায়ার

শিকারের যে কয়টা আকর্ষণ আছে তার মধ্যে আমার মতে একটা বড় আকর্ষণ হচ্ছে ক্যাম্পফায়ার। দিনে শিকারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর ক্যাম্পে ফিরে সন্ধ্যার পর একটা সমতল জায়গা বেছে নিয়ে গোল হয়ে বসা। মাঝখানে গাছের গুড়ীর গন্‌গনে আগুন। একধারে একটা ক্যান্‌ভাসের ক্যাম্প চেয়ারে বসেছি, কম্বল মুড়ি দিয়ে। আর হচ্ছে গল্প। দুনিয়ার যত রকম গল্প, রাজনীতি থেকে ভূত পর্যন্ত। তবে শিকারের গল্পই বেশী। আর তা হবেই তো। দেখেছি ক্যাম্পফায়ারের এই পরিবেশে নেহায়েৎ চাপা মানুষও দিল খুলে গল্প আরম্ভ করে। অন্য সময় যা অনেক চেষ্টা করেও তাদের মুখ থেকে বের করা যায় না তাও নিজের থেকে বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝেই চা না হয় কফি আসছে। আগুনের দিকে পা বাড়িয়ে গরম চা-তে চুমুক দিতে দিতে সবার সরল গ্রাম্য রসিকতা শুনতে শুনতে মন আর ক্লান্ত হাড়গুলো সত্যি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

তাদের মধ্যে অনেকেই দিনের ঝাড়ুগুলোয় ছিলেন; দিনের ঘটনাগুলো ভাল করে শুনি, দেখি অনেক নতুন ঘটনা শুনতে পাচ্ছি যা আমি তখন কিছু দেখিনি, শুনিনি। হয় কি, শিকারী তো শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কোথায় কি হচ্ছে সব জানতে পারে না। কে সাহস দেখাবার জন্য লাইন ছেড়ে আগে গিয়ে বন-বেড়াল দেখে কেমন করে দৌঁড় দিয়েছিল। কার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে শুয়োর দৌঁড়ে যাবার সময় নেহায়েৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিঠের উপর বসে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিল এবং তারপর তার মুখের অবস্থাটা কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়, এসব খবর পাওয়া যায় তখন।

আর পাওয়া যায় মানুষের ভয় পাওয়া মনোবৃত্তির খবর, যাকে বলে Fear Complex। সত্যি অদ্ভুত এই Complex, এর পাল্লায় পড়ে মানুষ কি না করে, কত অসাধ্য সাধনই না করতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়। কিন্তু শিকারীর পক্ষে এইসব নিজে দেখার ভাগ্য খুব কম হয়। অধিকাংশই পরে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে সে জানতে পারে।

মনে আছে, একবার একটা লেপার্ড ভয়ঙ্কর Charge করেছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম টিলাটার পা ঘেষে জঙ্গলের ধার থেকে গজ দশেক ভেতরে। আমার পেছনে, জঙ্গলের

বাইরে বাইরে জন-পঞ্চাশেক ঝাড়ুদার ছিল দাঁড়িয়ে। বাইদটার ওপারেই আবার একটা টিলা আর বন। এদিকের টিলাটার গা বেয়ে বাঘটা তীব্র গতিতে নেমে আসছে আমার দিকে। মুখটা হাঁ করা, সামনের Canine দাঁতগুলো বের হয়ে আছে, ঠোঁট দু'টো পেছন দিকে সরে গেছে, কান দু'টো মাথার সঙ্গে চেপ্টে লেগে আছে, লেজটা বন্দুকের নলের মত সোজা, প্রচণ্ড রাগে চোখ দু'টো আগুনের মত জ্বলছে আর প্রতি গর্জনে গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত কাঁপছে। সত্যি ভয়ঙ্কর। আমার তখন মোটেই চোখ ফিরিয়ে দেখার উপায় নেই পেছনে কি হচ্ছে।

আল্লাহ সেদিন অতি অল্পের জন্য বাঁচিয়েছিলেন; সে লম্বা কাহিনী। তারপর ওটাকে মেরে ফেলার পর রাত্রে ক্যাম্পফায়ারে বসে যা শুনলাম– তার মধ্যে দু'টো ঘটনা এই যে আমার পেছনের লোকগুলো আমাকে একা ঐ জঙ্গলে ফেলে দৌঁড়ে বাইদ পার হয়ে ও পাশের বনে গাছে উঠতে থাকে। কিন্তু মুশকিল হয়েছিল এই যে ও বনটা ছিল অল্পদিনের, চড়ার মত বড় গাছ ছিল না। শুধু সীমানা ঠিক রাখার জন্য যে দু'টো-চারটে গাছ Forest বিভাগ থেকে রাখা হয় তারই দু'টো কি তিনটা গাছ ছিল সেগুলোও মাঝারি ধরণের গজারির চারা। এই কয়টা গাছে অত লোক কি করে আর ধরবে। একজনের পর একজন করে জন-বিশেক লোক উঠবার পর একটা গাছ শেকড়শুদ্ধ উপড়ে পড়ে যায় আর ঐ উপরে পড়া গাছটাকে লোকগুলো আঁকড়ে ধরেই মাটিতে পড়ে থাকে। ওরা বোধ হয় ভাবছিল গাছে উঠেছি খুব নিরাপদ জায়গায় আছি।

আরেকটা গাছের নিচে Muzzle Loading যাকে বলে গাদা বন্দুক, তা নিয়ে মোহন নামে এক মান্দাই বসেছিল। বাঘ যখন Charge করেছে তখন মোহন হাতের বন্দুক মাটিতে রেখেই উঠে লাফ দিয়ে গাছটার নিচের দিকের একটা ডাল ধরেছে। ডালটা এমনিতেই মোহনের ভার সইবার উপযুক্ত ছিল না, তার উপর যখন একটা পা গাছে ঠেকিয়ে, ওপরে ওঠবার জন্য হ্যাঁচ্কা ঝাঁকি দিয়েছে তখন ডাল গেছে ভেঙ্গে। ঠিক তখনই ঐ গাছটার নিচ দিয়ে চার-পাঁচজন লোক দৌঁড়ে যাচ্ছিল। পড়বি তো পড়, মোহন পড়েছে ঠিক ওদেরই ঘাড়ে। আর কি! ওরাতো একদম নিশ্চিত যে বাঘেই ধরেছে ওদের। তারপর নাকি ওখানে এক হুলস্থূল ব্যাপার– ওরে বাপরে, খেয়ে ফেলল রে, বাঘে ধরেছে রে। ইত্যাদি যা সাধারণত আমরা এ রকম অবস্থায় ধারণা করে থাকি।

এইসব ব্যাপার ঘটেছে আমার থেকে মাত্র এক-শ’ গজের এদিকে, অথচ আমি কিচ্ছু জানি না।

ভয়ের কথা বলছিলাম। সত্যি যখন ভয়ের কোন কারণ হয় তখন প্রায় সবাই অল্পবিস্তর ভয় পায় আর তাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কেউ একদম ভয় না পেয়ে বা সামান্য ভয় পেয়ে চোখ খুলে চারদিক দেখতে পারেন তবে সত্যিই উপভোগ করার অনেক কিছুই পাবেন। যারা ভয় পেয়ে অদ্ভুত একটা কিছু করে বসে, পরে তারা নিজেরা সেটা উপভোগ করে। এমনি মজার ঘটনা শিকারে অনেক ঘটে। অনেক ঘটনা অতি সামান্য। মুখের চেহারা, একটু চাউনি, একটি বা দু’টো কথা, ওরই মধ্যে হেসে আকুল হওয়ার জিনিস পাওয়া যায় যদি দেখবার চোখ আর উপভোগ করার মন থাকে।

পুরোনো ঘটনা বলছি।

দাদার অনেক পারিষদ ছিলেন আগেকার জমিদারদের যা থাকত। বুঝে সুঝেই পারিষদ শব্দটা ব্যবহার করলাম। এর মধ্যে জমিদারীর বড় আমলারা থাকতেন, আবার বাইরের লোকও থাকতেন। সকালে এবং সন্ধ্যার পর দাদা, আব্বা এবং চাচ্চা এরা যখন মজলিশ করে বস্‌তেন তখন এরাই সব করতেন আসর গুলজার।

আবার যখন কোথাও বেড়াতে বা শিকারে যেতেন এরা থাকতেন সঙ্গে। তাদের নিয়ে মজা করতেন, ভয় দেখাতেন, এমন কি নাজেহাল করতেও ছাড়তেন না। কিন্তু যখন কোন অপ্রিয় সত্য বলার প্রয়োজন হত এবং কেউ সাহস পেত না, তখন ম্যানেজার এদেরই শরণাপন্ন হতেন। মেজাজ বুঝে এরা বলতেন এবং কাজ হত। দাদা রাগ করতেন না।

এদের সম্বন্ধে কোন্ শব্দ ব্যবহার করলে প্রগতিবাদীরা খুশী হন, তা আমি জানি। কিন্তু এসব পারিষদরা আপদ বিপদে, অসুখে বিসুখে যেমন করে এসে দাঁড়াতেন তা ভুলবার নয়। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দুইজন। এই দুইজন যেন ফরমায়েস দিয়ে তৈরী হয়েছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ কুলতিলক সান্যাল মশায়। আর একজন নাম করা মুসলিম বংশের হাজী সাহেব। সান্যাল মশায় প্রায় ছ’ ফুটের কাছাকাছি উঁচু, কিন্তু শুকনো; বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে কথাবার্তা বলতেন আর হাজী সাহেব ঠিক তার উল্টো, সাধারণভাবে উঁচু, খাটোই বলা চলে, মোটা আর এত সরল যে বোকাই বলা যায়, তড়বড় করে যা কথা বলতেন তা বোঝাই দায় ছিল। এদের

দেখলে আমার কেবল লরেল হার্ডি আর বাড এ্যাবোট লুই কাস্টিলোর কথা মনে পড়ে হাসি আসত।

আমার একবার খুব অসুখের সময় সান্যাল মশায় সারারাত্রি জেগে আমার শুশ্রুষা করেছিলেন। হাজী সাহেব এবং অন্যান্যরাও এমন অনেক করেছেন। না, প্রগতিশীলদের খুশী করতে আমি তাদের অসম্মান করে মোসাহেব শব্দ ব্যবহার করব না। যদি পারিষদ শব্দ ব্যবহার না করি তবে যে শব্দটা ব্যবহার করব তা হচ্ছে– বন্ধু।

একবার শিকারে দাদা একটা লেপার্ডকে গুলী করেছিলেন। গুলীটা লাগল একটু নিচে– সামনের হাতটা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গুলীতে ঠিক উল্টো দিকের পেছনের পাটাও গেল ভেঙ্গে। লেপার্ডটা ছিল অসম্ভব রকমের বড়। দাদার জীবনের অসংখ্য লেপার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আট ফিট আট ইঞ্চি। ভীষণ একটা গর্জন করে ওটা ঐ অবস্থাতেই জঙ্গলে ঢুকে গেল। কিছুদূরেই একটা গাছেই ছিলেন হাজী সাহেব। আহত বাঘের প্রচণ্ড গর্জনের শব্দে সাথে সাথেই তিনি সর্ সর্ করে গাছের ওপর দিয়ে উঠতে উঠতে একেবারে এমন মগডালে চলে গেছেন যে গাছের মাথাটা ওর ভারে একদিকে কাঁৎ হয়ে গেছে! ভাঙ্গে আর কি।

শিকার শেষ হবার পর হাজী সাহেবের খোঁজ করে তাকে তো ঐ অবস্থাতেই পাওয়া গেল, কিন্তু মুশকিল হ'ল তাকে নামান নিয়ে। এমন জায়গায় গেছেন যে, অন্য কেউ যে উঠে সাহায্য করবে তারও উপায় নেই। কিন্তু শুধু ওখানে থেকে চেঁচাচ্ছেন, 'হায় হায়, নামব কি করে?' আব্বা বললেন, 'যেমন করে উঠেছেন, ঠিক তেমনি করে নামেন।' অনেক কষ্ট করে শেষে তাকে নামান হ'ল।

নামলেন তো তিনি, কিন্তু তার নিজের কাছেই চিরদিন একটা প্রশ্ন হয়ে থাকল, কেমন করে তিনি ওখানে উঠলেন এই মোটা শরীর নিয়ে।

এক রাত্রে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে নানা গল্পের মাঝে সেই শিকারটার কথা এসে পড়ল। কথাটা কিন্তু হাজী সাহেবকে নিয়ে ওঠেনি, শিকার নিয়েই উঠেছিল। প্রসঙ্গটা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আব্বা আড় চোখে হাজী সাহেবের মুখটা দেখে নিয়ে হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বললেন, 'হাজী সাহেব, আপনি ঠিক এখন কি ভাবছিলেন আমি জানি।' হাজী সাহেব অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, 'বলেন দেখি।' আব্বা বললেন, 'আপনি ভাবছিলেন কেমন করে অত উঁচুতে উঠলেন, তাই না?' হাজী সাহেব একগাল হেসে স্বীকার করলেন।

Fear complex সম্পর্কে বলতে গেলে আরো একটা কথা বলতে হয়। প্রত্যেক বন্য পশুর গলার আওয়াজে আল্লাহ এমন একটা কিছু দিয়ে দিয়েছেন যা শুনলে ভীতির উদ্রেক হয়, অর্থাৎ ভয় লাগে। এটা শুধু বন্য পশু নয়, গৃহপালিত পশু সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে হিংস্র বন্য পশু যখন রাগান্বিত হয়ে হুঙ্কার দেয় বা অন্যকে আক্রমণ করে তখন যে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে তা বায়ুমণ্ডলকে বিধ্বস্ত করে দেয়। কতবার দেখেছি এই আওয়াজে মানুষ নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে কত অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা করে ফেলেছে, নিজের কাপড় চোপড় নষ্ট করে ফেলেছে। যে সান্যাল মশায়ের কথা একটু আগে বলে এলাম তাকে একদিন বলতে শুনলাম, তিনি আমার দাদাকে বলছেন, 'হুজুর! বাঘের আওয়াজের মধ্যে Purgative (জোলাপ, পায়খানা হওয়ার ওষুধ) আছে।' কথাটা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়।

জিম করবেট, যাকে আমি গত শতাব্দির বিপদ্‌জনক শিকারের (Big game) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মনে করি, তিনিও একবার জঙ্গলে ঢুকে একটা বাঘকে গুলী করার পর আহত বাঘের গর্জনে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে আধ ঘণ্টা পড়ে ছিলেন। একবার

পার্বত্য চট্টগ্রামের (Hill tracts) বন অঞ্চলে অন্ধকার রাতে ঘুরতে ঘুরতে আমার অজান্তে আমি এক হাতির দলের কাছে চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা হাতি, মনে হ'ল পুরুষ হাতি--আওয়াজ করে উঠল। কি কারণে হাতিটা এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ করল জানি না, আমাকে দেখে ফেলেছিল কিনা তাও জানি না। কিন্তু ঐ আওয়াজে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম এবং হাতে হাতি শিকারের রায়ফেল থাকা সত্বেও পালিয়ে এসেছিলাম।

নয়

মান্দাই

একটু আগে মোহন মান্দাইর কথা বলেছি। বোধহয় ভুরু কুঁচকে ভাবছেন মান্দাই আবার কি? খুব স্বাভাবিক, কারণ এ পর্যন্ত এদের উল্লেখ কোন বইয়ে বা কোথাও পাইনি। অথচ এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার আছে। এরা এদেশেরই মানুষ– এই পূর্ব-পাকিস্তানেরই, অথচ আমরা এত কম জানি এদের সম্বন্ধে। আমিও যে বেশী কিছু জানি তা নয়। শুধু শিকারে যেয়ে ওদের সাহায্য আমাদের নিতেই হত। এভাবে শিকারের সময়ই ওদের সংস্পর্শে এসে সামান্য যা জেনেছি তা থেকে কিছু আমায় বলতেই হচ্ছে। ভাল করে জানতে গেলে এদের নিয়ে রীতিমত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান– Research দরকার।

গারো পাহাড়ের পায়ের কাছ থেকে শুরু হয়ে যে বনটা মোমেনশাহীর কাছ দিয়ে মধুপুর, ধলাপাড়া, বহেড়াতলী, রতনপুর, আর পাথরঘাটী হয়ে দক্ষিণ কোণের দিকে নেমে গেছে এ বনটারই জায়গায় জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে এই মান্দাই জাতটার বাস। ঢাকা থেকে ট্রেনে মোমেনশাহী যেতে রাস্তায় যে জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর এই স্টেশনগুলো পড়ে এগুলো এই বনের এলাকার মধ্যেই। বাসে ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল, আর টাঙ্গাইল থেকে মোমেনশাহী যেতে এই বনই পার হতে হয়। কত যুগ থেকে এখানে এদের বাস কেউ বলতে পারে না। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত এই সমস্ত বনটায় শুধু ওরাই থাকত। সামান্য দু'চার ঘর হিন্দু-মুসলিম বসতি ছিল। তখন এই মান্দাইয়ের সবার অবস্থাই ছিল খুব স্বচ্ছল। টিলাগুলোর ফাঁকে ধান আর অন্যান্য ফসলের আবাদ করে আর শিকার করে যতটুকু সম্ভব আনন্দেই ছিল।

তারপর আরম্ভ হ'ল সমতল এলাকার লোক সংখ্যার চাপ। সমস্ত পৃথিবীর Statistics-এ এই এক ব্যাপারে, অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যায় আমরা সবচেয়ে উঁচু আসনে গ্যাট্‌ হয়ে বসে অন্যান্য জাতির ঈর্ষা আকর্ষণ করছি। যাই হোক, লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেল অথচ সেই অনুপাতে জমি বাড়ল না তখন ক্রমশঃ লোক পাহাড়-বনে উঠে বন সাফ্‌ করে বসতি আর ক্ষেত-খামার করতে আরম্ভ করল। কেমন করে, সৎ অসৎ সবরকম উপায়ে আস্তে আস্তে এইসব মান্দাইদের জমিজমা এইসব নতুন আবাদীদের হাতে আসতে আরম্ভ করল। বুনো জাত যা হয়ে থাকে– অত্যন্ত সরল, তাই এদের ঠকাতে নবাগতদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এমনি করে অনেক অবস্থাপন্ন বর্ধিষ্ণু মান্দাই একবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তখনকার বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আইন করতে হয় যে কোন মান্দাইয়ের সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর হতে পারবে না। নবাগতদের মধ্যে বেশীই ছিল মুসলিম চাষী– তাই এটা আমাদের পক্ষে ঠিক খুশীর কারণ নয়।

মান্দাইরা নিজেদের বলে হিন্দু। আর বলে, আমরা শিব থেকে জন্ম নিয়েছি। বলে বটে, কিন্তু ওদের জীবনযাত্রা ঠিক হিন্দুদের মত নয়। উঁচু হনুর হাড়সহ মুখটা চ্যাপ্টা ধরনের, খাঁদা নাক, চীনাদের মত চোখ, খাটো– অর্থাৎ পুরো মঙ্গোলিয়ান। গায়ের রং দু'রকমেরই আছে, প্রায় কালো আর খুব সামান্য হলদে মেশান ফর্‌সা। পুরুষ মেয়ে সবাই কাজ করে।

এদের প্রথম দেখি ছোট বেলায় শিকারে গিয়ে। ক্যাম্পে পৌঁছেই আব্বা ঐ এলাকার নায়েবকে বললেন– 'কাল সকালেই বিহারীকে আনাও'। জিজ্ঞেস করে জানলাম বিহারী মণ্ডল হ'ল মান্দাইদের সর্দার। এরা মাতব্বর বা মোড়লকে মণ্ডল বলে। অবশ্য সাধারণ মান্দাইকেও মণ্ডল বললে খুব খুশী হয়। প্রায় সত্তর-আশী মাইল লম্বা আর পঁচিশ মাইল প্রস্থ সমস্ত বন এলাকার মান্দাইদের একচ্ছত্র সর্দার। খুব কৌতুহল হ'ল। এমনিতেই তো ছেলে বেলার সাধারণ কৌতুহল ছিল, তার ওপর শিকারের গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ওদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম। বিশেষ করে একটা গল্প দাদার কাছে শুনেছিলাম।

অনেক আগে দাদার শিকার জীবনের প্রথম দিকটায় তখনও বনে এত লোক ওঠেনি একবার শিকারে গিয়েছিলেন। যথারীতি সব বড় বড় প্রজারা এসেছেন দেখা করতে। অনেকেই তার মধ্যে মান্দাই এবং মণ্ডল। দাদা তাদের বলে দিলেন শিকারের খবর, লোকজন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে। ওরা শুনল, তারপর ওদের ভাষায় নিজেদের

মধ্যে কী যেন পরামর্শ করে বলল– 'হুজুর! বাঘতো বের করে দেব কিন্তু তুই মারবি কি দিয়ে দেখতে চাই'।

ওরা 'আপনি' বলতে পারে না– অন্ততঃ তখন পারত না মোটেই। সে লাট সাহেব হলেও 'তুই'। যাই হোক দাদা তার দু'নলা রায়ফেলটা বের করিয়ে ওদের হাতে দেওয়ালেন।

রায়ফেলটা হাতে হাতে সব মণ্ডলের কাছ থেকে ঘুরে এল। নিম্নস্বরে নিজেদের ভাষায় কিছু যেন সমালোচনাও হ'ল। মনে হ'ল, রায়ফেলের নলের সরু ছিদ্র সম্বন্ধে। তারপর যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল– 'এটা ঠুসোস্ কেমন করে?' অর্থাৎ গুলী ভরিস কেমন করে? দাদা তখন রায়ফেলটা নিয়ে Breech খুলে দেখালেন কেমন করে গুলী ভরতে হয়। রায়ফেলের Breech-টা খুলতেই ওরা একে অপরের মুখের দিকে চাইতে লাগল যেন যা ভেবেছি তাই। তারপরই ওরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের একটা গাছ তলায় গিয়ে কী যেন পরামর্শ করতে লাগল।

দাদা ভাবছেন– কি হ'ল। এমন কি হ'ল যে এত গভীর পরামর্শ দরকার। যাই হোক অল্পক্ষণ পরেই সন্দেহ নিরসন হয়ে গেল। দেখা গেল ওরা আসছে মুখ চোখ অত্যন্ত গম্ভীর। একজন বয়স্ক মণ্ডলকে মুখপাত্রও ঠিক করেছে দেখা গেল। সবাই ঘরে ঢুকলে মুখপাত্রটি দাঁড়িয়ে বলল– 'হুজুর! তুই বাড়ী ফিরে যা। তুই বাঘ মারতে পারবি না।'

দাদা হতবাক হয়ে গেলেন। বলে কি। বাঘ মারতে পারব না। কেন?

মুখপাত্রটি মরিয়া হয়ে বলল– 'তুই বাঘ মারতে পারবি না। তুই মাজা ভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে এসেছিস বাঘ মারতে। তুই ফিরে যা।'

এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দাদা হেসে উঠলেন। হয়েছে কি– ওদের সবার বন্দুক হ'ল সেই পুরোনো Muzzle Loading, যাকে বলে গাদা বন্দুক। তখন পর্যন্ত ওরা Breech Loading বন্দুক বা রায়ফেল কোনদিন দেখেইনি। যে বন্দুক নিজের কোমরই সোজা রাখতে পারে না সে যে বিপদের সময় শেষরক্ষা করতে পারবে তারই বা বিশ্বাস কি! তাই মাজাভাঙ্গা বন্দুকে ওদের এত অবিশ্বাস, তার ওপর নলের সরু ছিদ্র তো আছেই।

আটিয়ার বনে বন্য-মোষ শিকার করেন আমার দাদা

যাই হোক, ওদের আস্থা অর্জন শিকারে নেহায়েৎ দরকার, তাই দাদা ঐ মাজাভাঙ্গা বন্দুক নিয়ে দু'একটা গুলী ছুড়লেন। শক্তিশালী রায়ফেলের পাহাড় কাঁপানো আওয়াজ আর মাটিতে বিরাট গর্ত পর্যবেক্ষণ করে তবে ওরা আশ্বস্ত হয়েছিল যে না, মাজা ভাঙ্গা হলেও ও দিয়ে বাঘ মারা যাবে।

পরের দিন সকালেই এই মান্দাইয়ের সর্দারকে দেখতে পাব জেনে ছেলেবেলার প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে শুতে গেলাম। সকালে চা খাওয়ার পর বাংলোর নিচে ডেক চেয়ার পেতে আব্বা বসেছিলেন। শিকারের আয়োজনের কথাবার্তা হচ্ছিল, এমনি সময় দেখি বাংলোর সামনের গেইট দিয়ে একজন লোক ঢুকছে, সঙ্গে আমাদের বরকন্দাজ।

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, এই বিহারী; উঁচুতে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফিট, ওদের তুলনায় বেশ লম্বা, মোটা কিন্তু নাদুস-নুদুস নয়, নিরেট। পেটটা একটু উঁচু, পায়ের গোছগুলো বড় বড়, আর শক্তিশালী। চওড়া বুক আর সেই মঙ্গোলিয়ান মার্কা মুখ। সবচেয়ে সুন্দর ওর গায়ের রং। ফরসা রং রোদে পুড়েছে কিন্তু তামাটে হয় নি– হয়েছে টুকটুকে লাল। রোদে এতদূর হেঁটে এসে গাল দু'টো– কী বলব সেই চিরাচরিত পাকা আপেলের মতই লাল হয়েছে। পরনে ধুতি আর হাত কাটা ফতুয়া, খালি পা, আর হাতে একটা পাকানো মজবুত লাঠি, পাহাড়ীদের চিরসঙ্গী।

হাতের লাঠিটা মাটিতে রেখে এগিয়ে এসে আব্বার সামনে বসে সালাম করল। কে যেন আমাকেও দেখিয়ে দিল। আমার সামনে আসতে আমি বাধা দিলাম, পায়ে হাত দিতে দিলাম না। ওকে বসতে দেয়া হ'ল। তারপর আব্বা ওর কাছ থেকে শিকারের খবর নিতে লাগলেন।

আমি বসে বসে অবাক হয়ে বিহারীকে দেখছিলাম। জংলী জাত, কিন্তু মুখে বংশপরম্পরায় সর্দারি করার কর্তৃত্বের ছাপ– ভুল করার উপায় নেই। মান্দাইরা সাধারণতঃ একটু তড়বড় করে কথা বলে, দেখলাম সর্দারও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু কই, ওরা নাকি সবাইকে তুই বলে; এতো পরিষ্কার ব্যতিক্রম 'আপনি'ই বলছে আব্বাকে। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা বুঝলাম। কী একটা কথায় ও একটু জোশ এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গেই 'তুই' বেরিয়ে গেছে। বলে ফেলেই একেবারে লাল হয়ে কথার খেই হারিয়ে ফেলে সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চাইছে আর উপস্থিত সবাই এ ওর দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে আব্বা কথার জের টেনে ব্যাপারটাকে চাপা দিলেন।

ব্যাপারটা বুঝলাম। নায়েব আর কর্মচারীদের কীর্তি। ওকে আগে থেকে বোঝান হয়েছে যে 'তুই' বলাটা মহা-অসভ্যতা। হুজুরকে 'আপনি' বলতে হয়। কিন্তু আজন্ম অভ্যাসী, অসতর্ক মুহূর্তে সেই 'তুই' বেরিয়ে গেছে।

সেদিন আব্বা উঠে গেলে বিহারীকে নিয়ে পড়লাম। প্রথমেই গম্ভীর মুখে বললাম– 'আমাকে 'আপনি' বলবে না, 'তুই' বলবে, বুঝলে?'

শুনে বিহারী কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। চোখে শঙ্কিত দৃষ্টি, যেন কোথায় কি অপরাধ করে ফেলেছে তাই ভাবছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু এরা ওর মাথায় বেশ ভাল করেই ঢুকিয়েছে দেখলাম---'না না হুজুর! তা কি হয়? আপনারা মা-বাপ, 'তুই' বলা পাপ।' বুঝলাম এমনি হবে না। ওর সামনেই নায়েবকে ডেকে বললাম, 'বিহারী আজ থেকে আমাকে 'তুই' বলবে। যদি আবার কখনও ওর মুখে 'আপনি' শুনি তবে ওকে কিছু বলব না, আপনার কাছ থেকে তার কারণ জিজ্ঞেস করব।'

নায়েব সাহেব মিনমিন করে বললেন, 'কিন্তু হুজুর! এ কেমন কথা হয়। তাছাড়া বড় সাহেব কী ভাববেন।' বললাম, 'আব্বাকে যা বলার আমি বলব। ওদের মুখ থেকে 'আপনি' অত্যন্ত বেমানান শোনায় আমার কানে। ওদের কাছ থেকে 'তুই' শুনতে আমার খুব ভাল লাগে– ব্যস।'

তরফপুর এলাকায় মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করেন আমার বাবা, সাথে দাঁড়ানো আমার দাদা

পরে আব্বাকে বললাম কথাটা। আব্বা বললেন, ‘ওরা তো নিজেরাই ‘আপনি’ বলতে চেষ্টা করছে আজকাল।’ বললাম, ‘মোটেই না। আপনার নায়েব আমলাদের সভ্যতা প্রসারের দুশ্চেষ্টা। আমি মানা করে দিয়েছি।’

আব্বা হেসে বললেন, ‘বেশ করেছ।’

তারপর মান্দাই অনেক দেখেছি, মিশেছিও ওদের সাথে আর খানিকটা জেনেছিও ওদের সম্বন্ধে। কিন্তু মান্দাই শব্দটার অর্থ কি কোনদিন মনে জাগেনি।

মনে আছে এক ভীষণ গরমের দিনে বন ঝাড়ু দিয়ে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের গুড়ীতে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম করছিলাম। অনেক লোক। সবাই গরমে কাবু হয়ে গাছের ছায়াতেই বসেছে চারপাশ দিয়ে। অনেকগুলো মান্দাইও ছিল। শুনলাম ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, ওদেরই ভাষায়।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘তোমাদের ভাষার নাম কি?’

একজন বলল, ‘ঠাঢ়’।

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ঠাঢ়ে বাঘকে কি বলে? বলল, ‘মাশ্‌ষা’।

এমনি অলসভাবে ওদের ভাষায় এটাকে কি বলে, ওটাকে কি বলে শোনবার পর জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা, তোমরা তো মান্দাই, না?’

সব ঘাড় নাড়ল।

বললাম, 'মান্দাই শব্দটাতো ঠাড়। বাংলায় মান্দাই মানে কি?'

বলল, 'মানুষ'।

এ্যা!!

একজন বিষদ বিবরণ দিল, মান্দাই শব্দটার অর্থই হ'ল মানুষ। কথাটা হজম করতে সময় লাগল। আমরা পাঠান, মোগল, শক, হান, আর্য, অনার্য, সেমেটিক আর নিগ্রো সব দু'পেয়ে জানোয়ার, একমাত্র ওরাই মানুষ। ব্যাপারটাতে যাতে কারো কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে তাই জাতটারই নামকরণ করেছে 'মানুষ' বলে। খুব খুশী হলাম, জাতটার আত্মমর্যাদা জ্ঞান আছে।

আত্মমর্যাদা জ্ঞান যে ওদের কারো কারো এখনও আমাদের অনেক শিক্ষিত 'প্রাণী'র চেয়ে বেশী আছে তার পরিচয় পেয়েছিলাম একবার ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে শোনা এক কাহিনীতে।

শীতের রাত্রে গন্‌গনে আগুনের পাশে বসে যথারীতি গল্প হচ্ছিল। সেদিন আমাদের বন অনেক বছর আগে কেমন ছিল সেই কথা হচ্ছিল। একজন বুড়োগোছের লোক, বনের পুরোনো বাসিন্দা, বলছিল বন কেমন ছিল যখন সে ছিল যোয়ান।

'ঐ যে হুজুর বট গাছটা দেখা যাচ্ছে বাইদের ওপারে, ওর ডান দিকের চালাতেই আপনার দাদা সাত হাত লম্বা বাঘ মেরেছিলেন। আর সে বাঘও কি যে সে বাঘ হুজুর! এই আমার বুক সমান উঁচু তার পিঠ। সেটাকে হাতীর পিঠ পর্যন্ত ওঠাতে পারলাম না। শেষে মোষের গাড়ী করে নেয়া হয়েছিল।' বলে হাত বাড়িয়ে গাছটা দেখাল।

অনেক দূরে অর্ধেক চাঁদের আলো আর অন্ধকারে জড়াজড়ি করে বিরাট গাছটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম সেই কত বছর আগে দাদার রায়ফেলের আওয়াজে আর বিরাট বাঘের গর্জনে ওরই পাতাগুলো কেঁপে উঠেছিল। সে বন আর নেই, কিন্তু আজও ও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অতীতকে মনে করিয়ে দিতে; আর থাকবে কতকাল কে জানে।

মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এইখানে? ওখানে তো এখন খরগোশও পাওয়া মুস্কিল।' বুড়ো বলল, তাইতো বলি বনের এ কী দশা হ'ল। তখন এ বনে আমরা মাত্র কয়েক ঘর মুসলমান। আর সব মান্দাই। গরীব প্রায় কেউ ছিল না। এ দিকটায় মান্দাইয়ের বড়

মণ্ডল ছিল একজন, তার নামটা মনে নেই, সেই কত দিনের কথা, আমি তখন সবে বিয়ে করেছি। সেই মণ্ডলের অবস্থা ছিল সবচেয়ে ভাল। ধান কাটার সময় তার গোলায় ধান উঠত কমসে কম দু'শ মন। বাড়ীতে চারপাঁচটা টিনের ঘর। তার মধ্যে একটা, যেটায় সে নিজে থাকত, সেটা দোতলা। পনের বিশটা গরু, বলদ, মোষ আর পাঁচ ছয়টি গাড়ী। এমন অবস্থা এদিকে আর কারু ছিল না, বলে একটু থেমে বলল, কিন্তু হলে কি হবে, কপালটা ছিল ওর খুব খারাপ, নইলে কি আর দেশ ছেড়ে যেতে হয়।'

বললাম, 'দেশ ছেড়ে যেতে হয়! কেন?' বুড়ো বলল, 'সে অনেক কথা হুজুর।' উৎসুক হয়ে বললাম, 'তা হোক বল শুনি।' আগুনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে রেখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বুড়ো বলতে লাগল।

'--মণ্ডল লোকটি ছিল খুব ভাল। সব তার ছিল--শুধু ছিল না তার ছেলে। এত জমিজমা, বাড়ীঘর, সম্পত্তি, কিন্তু সে চোখ বুজলে খাবে কে? তাই ছেলের জন্য মণ্ডল একটা একটা করে কয়েকটা বিয়ে করে ফেলল। কিন্তু হবার মধ্যে হ'ল খালি মেয়ে। একটা না, দু'টা না, একে একে সাতটি।'

তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপ করে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল– 'মেয়েগুলো সবগুলোই ছিল খুব সুন্দরী। মণ্ডল ওদের বিয়েও দিয়েছিল ভাল ভাল ঘর বর দেখে। কিন্তু দিলে কি হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই দু'টো মেয়ে ঘরে ফিরে এল বিধবা হয়ে। ওদের তো বিধবার আর বিয়ে হয় না আমাদের সমাজের মত, তাই দু'জনাই রয়ে গেল বাপের বাড়ীতেই। মণ্ডল খুব ভালবাসত মেয়েদের। দু'বারে দু'মেয়ে ফিরে আসতে কী কাঁদাকাটিই না করল মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। আমার এখনও মনে আছে, আমরা গিছলাম মণ্ডলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে।

'যাই হোক, মেয়েরা তো রয়ে গেল বাপের বাড়ীতে। দু'জনারই কম বয়স। ফর্সা গায়ের রং, গড়ন সুন্দর।' বলে একটু চুপ করে থেকে কতকটা আপন মনেই আবার বলল– 'তেমন মেয়ে আজকাল আর দেখি না মান্দাইদের মধ্যে।'

'তখন হুজুর ভর, মানে সমান জায়গা থেকে সবে মানুষ কিছু কিছু পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমরা পুরনোরা, তাদের বন-জঙ্গল কেটে সাফ করতে সাহায্য করি। ওরা প্রথম প্রথম শুধুই ভয় খায়– তাই ওদের সাহস দেই, এইসব।

আমাদের বনের একটু জায়গা

'এই নতুনদের মধ্যে একবার এল এক যোয়ান ছোকরা। আমাদের সবার সঙ্গে পরিচয় হ'ল, মণ্ডলের সঙ্গেও হ'ল এক সময়। আর হ'ল তার দুই মেয়ের সঙ্গে। ওরা তো আমাদের মত পরদা করে না আর; বাইরে বেরিয়ে সবার সাথে কাজ করে। তাই তাদের সাথে দেখা হওয়ার কোন বাধা ছিল না।

'তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সবার লক্ষ্য পড়ল যে ছেলেটা কাজে অকাজে মণ্ডলের বাড়ী আসে, গল্প করে, নিজের কাজ ফেলে সময় কাটিয়ে যায়। আর দেখা গেল যে মণ্ডলের ছোট মেয়েটা যেন ওর আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে, বারে বারে দক্ষিণের চালার ওপর দিয়ে যে লাল মাটির পথটা আছে সেই দিকে চেয়ে থাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

'তারপর ক্রমে ব্যাপারটা মণ্ডলের কানেও উঠল। মেয়েদের মণ্ডল সত্যি ভালবাসত, তাই প্রথমে গা করল না। কিন্তু যখন একদিন ছেলেটা এসে তাকে বলল যে সে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। তখন সে একদম ফেটে পড়ল। ছেলেটাকে তো তাড়া করলই তারপর বাড়ীর ভেতরে গিয়ে মেয়েকে খুব শাসাল। এমন করে সে কোনদিন তার কোন মেয়েকে বকেনি।

'তারপর দিনকতক ছেলেটাকে আর মণ্ডলের বাড়ীর আশে পাশে দেখা গেল না। সবার মনে হ'ল ঔখানেই ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু সমাপ্তি যে ওখানে নয়, অত সহজে নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল হঠাৎ একদিন সকালে যখন দেখা গেল যে মণ্ডলের মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না।

'মণ্ডল প্রথমটায় জানতে পারেনি। ভোরে উঠেই সে চলে গিছল দূরের একটা ক্ষেতে ধান কাটার দেখা শোনা করতে। বাড়ীর মেয়েরা অবশ্য সকালেই জানতে পেরেছিল, আর কি হয়েছে তা আঁচ করতে পেরে সব ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিল। তাই দুপুরের আগে সে কিছুই জানতে পারেনি। ধান কাটার তদারক শেষ করে এতটা পথ রোদে হেঁটে এসে মাত্র বসেছে, এমনি সময় খবর নিয়ে ফিরে এল তারা, যাদের মণ্ডলের বৌয়েরা পাঠিয়েছিল সেই ছেলেটার বাড়ীতে নিঃসন্দেহ হবার জন্য। তারা জানল, সন্দেহ সত্য। মেয়ে সেখানেই আছে আর তাদের জানিয়ে দিয়েছে, সে আর ফিরবে না, শীগগীরই তাদের বিয়ে হচ্ছে।

'মণ্ডল ঐ তখন প্রথম জানল ঘটনাটা। হুকোটা সবে তখন ধরিয়েছে দাওয়ায় বসে। পাথরের মূর্তির মত বসে রইল প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর হাতের হুকোটা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে বলতে লাগল– 'ওরে তোরা কাউকে এখন বলিস না। দোহাই তোদের কাউকে কিছু বলিস না। আমায় শুধু আজকের দিনটা সময় দে। তোরা কাল বলিস– শুধু আজকের দিনটা কাউকে বলিস না।'

'যারা খবরটা নিয়ে এসেছিল তারা এতক্ষণ দাওয়ার নিচেই মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। ওদের সর্দারের মনে কী হচ্ছিল খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল বই কি। এবার তারা আস্তে আস্তে উঠোন থেকে বেরিয়ে গেল।

'ওরা যেতেই মণ্ডল তার সব বউদের আর মেয়েকে ডেকে একত্র করল। তারপর তার হুকুমে আরম্ভ হ'ল বাঁধাছাদা। মেঝে খুঁড়ে সোনা রূপা বের হ'ল, কাঠের কয়েকটা সিন্দুকে বোঝাই হ'ল কাপড় চোপড়। বিছানা-পত্র, থালা-বাসন আর বউদের গয়না। সব গোছান শেষ করতে করতে বেলা বয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হ'ল– রাত্রি এল।

'তারপর গরুর আর মোষের গাড়ীতে সব মালপত্র বোঝাই করে সেই রাত্রির অন্ধকারে নিঃসাড়ে মণ্ডল তার সমস্ত পরিবার নিয়ে কোথায় চলে গেল কেউ বলতে পারে না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গেল তোমরা কেউ একটু খোঁজ পর্যন্ত করলে না?'

'––হুজুর! আমরা তো ব্যাপারটা জানলামই তার পরের দিন। নইলে কি আর অমন করে মণ্ডলকে আমরাই যেতে দেই। মণ্ডলের গাড়ীগুলো যারা চালিয়ে নিয়ে গিছল তারা সবাই ছিল মান্দাই। ওরা খালি গাড়ী নিয়ে ফিরে এলে আমরা ব্যাপারটা জানলাম। ওদের প্রশ্ন করেও বিশেষ কিছু বের করা গেল না। শুধু বলল যে মণ্ডলকে তারা শ্রীপুর রেল ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। তারা কোথাকার টিকেট করেছে কোথায় যাচ্ছে কিছুই তারা জিজ্ঞেস করতে সাহস করেনি। মণ্ডলও তাদের বলেনি।'

সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মণ্ডলের জমিজমা, বাড়ী ঘর, এগুলোর কি হ'ল?'

বুড়ো বলল, 'সব ওমনি পড়ে ছিল। তখনকার দিনে তো মানুষের মধ্যে কিছুটা ঈমান ছিল, এখনকার মত হয়নি, তাই বছর ছয়েক তার সম্পত্তিতে কেউ হাত দেয়নি। তাছাড়া সবারই কেমন একটা আশা ছিল হয়ত কোনদিন মণ্ডল আবার ফিরে আসবে। কিন্তু এদিকে ভর থেকে লোক আসাও আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল, আর একটু একটু করে সেসব বেদখল হতে আরম্ভ হ'ল। মণ্ডল ফেরেনি, তার সব জমিজমা এখন অন্যের।'

কাহিনীটা শুনে মনটা অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পফায়ারের সমস্ত মজাটাই উড়ে গিয়েছিল সে রাত্রে। তারপর আর কারুরই কোন গল্প জমল না। খানিক পরে বললাম, 'এবার তোমরা এস, রাত মন্দ হয়নি।' ওরা চলে গেলে গন্‌গনে গুড়ীটার কাছে পা ছড়িয়ে দিয়ে বহুক্ষণ বসে ছিলাম একা একা।

শ্রান্ত শিকারীরাঃ মাঝে বসা আমার বাবা, ঠিক তার পেছনেই আমার চাচা সাঈদ খান পত্নী, শুয়ে আছেন–জি.এম.এম.ই. করিম

দশ

ধাঁধাঁ

উনিশ-শো’ উনপঞ্চাশ সন। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁয় গিছলাম। উদ্দেশ্য ছিল ছোট বোনের স্বামী দোজাকে দিয়ে একটা বাঘ মারানো। গল্পটা বলছি কারণ কত রকম অবস্থায় যে পড়তে হয় শিকারে তা একটু বোঝা যাবে গল্পটা থেকে।

দিন কয়েক রোজ বিকালে বক্‌রি Bait দিয়ে বসে বসে কোন বাঘ পেলাম না। রাত্রে বাঘ চলার সম্ভাব্য পথ দিয়ে ঘুরে ফিরেও কিছু হ’ল না।

ওখানে এরই মধ্যে কয়েকটা ছোট ছেলেপেলের সঙ্গে পরিচয় হ’ল। ওদের ভারী সখ হ’ল আমাদের সঙ্গে খরগোস শিকারে যাবে। কিন্তু আমরা যাই বাঘের আশায় পায়ে হেঁটে, সঙ্গে ছেলে পেলে বিপদ্‌জনক। তাই ওদের সঙ্গে নিতাম না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বেরুচ্ছি, সেদিন আর Bait দেবার কথা ছিল না, শুধু পায়ে হেঁটে বেড়ান, এমনি সময় ওরা এসে পিছু লাগল। ওদের মধ্যে একজনের নাম আবার সেলিম, আমার মিতা। বয়স বছর চৌদ্দ। ওর চেয়ে ছোট ছোট যে, তার হবে বছর বারো। আর সবচেয়ে ছোটজন বোধ হয় বছর দশেক। দোজাকে বললাম, ‘বাঘের দেখা তো পাচ্ছিই না। আজই যে পাব তারই কি মানে আছে? নেয়া যাক ওদের সঙ্গে, কী বল? খরগোস শিকার দেখবে।’

ওদের নেয়া হ’ল। আযীম ভাই বলে আমাদের এক আত্মীয়ও সঙ্গী হলেন। সেদিন ইচ্ছা করেই দূরে গেলাম না। একটা পাহাড়ী নদী ছোট্ট শহরটার গা ঘেঁষে গিয়ে বড় নদীতে পড়েছে। ওটা পার হয়ে ওপাশে বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে গোটা দু’য়েক খরগোস মারা হ’ল। শেষ খরগোসটা মেরে বিশ পঁচিশ পা গিয়ে বাঁ দিকে টর্চ জ্বালিয়েছি– দেখি লেপার্ড।

জায়গাটার একটু বিবরণ না দিলে এর পর যে ঘটনাগুলো ঘটল তা ঠিক বোঝাতে পারব না। মনে করুন আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে সে জায়গাটা একটা ছোট মাঠের মত। ঘাসে আর ছোট ছোট আগাছায় ঢাকা। জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে ফাঁক থাকে তারই একটা। মাঠটার পূর্বদিক দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝোরা নেমে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে। বাকি তিন দিকটাই জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকে জঙ্গলটা উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি পড়ে আছে, আর তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা সামান্য ফাঁক– এই ফিট আট দশেক হবে। টর্চ জ্বালাতেই দেখি একটা বাঘ ফাঁকটা পার হয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে।

যদিও বাঘটা সাধারণ ভাবে হেঁটেই যাচ্ছিল তবু হাতের টর্চ পকেটে পুরে কাঁধ থেকে রায়ফেল নিয়ে তৈরী হবার সময় ছিল না। চোখের সামনে বাঘটা ওপাশে ঢুকে গেল। এ রকমটা হলে যা হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আফসোস করছিলাম– হায় হায় কী হ'ল! এমন শিকারটা ফসকে গেল। হঠাৎ দেখি বাঘটা আবার ঠিক ঐ জায়গা দিয়েই আগের মত পার হচ্ছে।

গবেটের মত ইতিমধ্যেই রায়ফেলটাকে আবার যথাস্থানে অর্থাৎ কাঁধে ফেরত পাঠিয়েছি। আগের বারে যা হয়েছিল ঠিক তারই পুনরাবৃত্তিও হ'ল। কিছুই করতে পারলাম না।

প্রথমবারের দুঃখ রাখবারই জায়গা ছিল না। দ্বিতীয়বারের কথা কী আর বলব। ঐ খানেই ফাঁকটার দিকে টর্চ দিয়ে দেখছি। হঠাৎ দেখি ঐখানেই বাঘটা আবার বেরুল আর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল।

নিজেদের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার বাঘটা বেরুল, আর ঠিক এক জায়গায়। যাই হোক তখন আর ওসব ভাববার সময় ছিল না। আমি একা থাকলে কোন কথা ছিল না তখনই রায়ফেল উঠিয়ে গুলী বসিয়ে দিতাম। কিন্তু ওখানে ভাববার ছিল। উদ্দেশ্য ছিল দোজাকে দিয়ে মারাবার। তারপর পিছনে দাঁড়িয়ে তিন তিনটা বাচ্চা ছেলে।

আমি নিচু গলায় তাড়াতাড়ি দোজা আর আযীম ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলাম কী করা যায় এই বাচ্চাদের। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ফিস্‌ফিস্‌ করে ওদের বললাম তোমরা চট্‌ করে পেছনে যে ঝোরাটা আছে ওর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও– ঝোরা শুকনো এখন, তাড়াতাড়ি হেঁটে যাও। দাঁড়িও না।

কথা বলছি অবশ্য, কিন্তু আমাদের চোখগুলো বাঘের দিকে ধরা। ও ঐখানেই দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমি অপেক্ষা করছি যে ছেলেগুলো ঝোরার খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নামলেই দোজাকে বলব গুলী করতে। হঠাৎ দেখি বাঘটা আমাদের দিকে ঘুরল তারপর ঠিক ঐ ফাঁক বরাবর আমাদের দিকে আসতে আরম্ভ করল।

চমকে গেলাম। তিন তিনটে টর্চ জ্বলছে ওপর মুখ লক্ষ্য করে, আর একটু ভয় না করে আলোর দিকেই এগিয়ে আসছে। রায়ফেলের সেফটিটা অফ্‌ করে দিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম। বেশী এগিয়ে এলে দোজার জন্য অপেক্ষা করা চলবে না, যা করতে হয়

আমাকেই করতে হবে। এই ভাবছি, তখন বাঘটা জঙ্গল থেকে প্রায় সাত আট ফিট বেরিয়ে এসেছে। অতটুকু এসেই ও হঠাৎ কনুয়ের উপর ভর করে বসে গেল।

চকিতে একবার পেছন দিকে দেখে নিলাম। সে রাতটা ছিল খুব অন্ধকার। টর্চের আলো সামনের দিকে থাকলেও পেছন দিকে যে সামান্য একটু আলোর আভাস পড়ে, তাতে দেখলাম তিনটে মূর্তি ঝোরার খাড়া পাড়ের পেছনে টপাটপ মিলিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিত হলাম।

তিনটে টর্চের উজ্জ্বল আলোর ফোকাসের মাঝে বাঘ বসে আছে। ঠিক যেমন বেড়াল ইঁদুর ধরবার সময় বসে তেমনি করে। যদিও একদম খোলা জায়গায় বসা তবু সোজা আমাদের দিকে মুখ করে বসেছে বলে শরীরের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু সামনের হাত দু'টো, গলার কিছু অংশ আর মাথাটা। চোখ দু'টো থেকে আলো এমন ঠিকরোচ্ছে যে মনে হচ্ছে দু'টো টর্চ কেউ আমাদের পানে জ্বেলে দিয়েছে।

দোজাকে বললাম, 'নাও মারো। খুব ভাল করে নিশানা করো। এক গুলীতে ওকে ফেলা চাই কিন্তু; নইলে যে রকম সকম দেখছি তাতে বিপদ দাঁড়াবে।' আর আযীম ভাইকে বললাম, 'যদি গুলী খেলে বাঘটা চার্জ করে এবং মনে হচ্ছে গুলী সাংঘাতিক না হলে করবেই, তবে আপনি নিশানা করবার চেষ্টা না করে মোটামুটি ঐদিক লক্ষ্য করে গুলী করবেন।'

কিন্তু দেখলাম দোজা ব্যাপারটার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছে, কারণ ও বলল, 'সেলিম ভাই, আমার হাত এত পাকা নয় যে আমি একদম নিশ্চিত হয়ে গুলী করতে পারি যে বাঘ ওখানেই পড়বে। তারচেয়ে তুমিই মার।'

বললাম, 'তুমি যতটুকু সম্ভব সতর্ক হয়ে নিশানা করে মেরে দাও। তারপর দেখা যাবে। আল্লাহ যা করেন।' কিন্তু ও বলতে লাগল, 'তুমি মার।'

ফিসফিস করে তর্ক করায় জ্যুৎ হয় না বিশেষ করে বাঘ সামনে নিয়ে। নইলে ওকে বোঝান দরকার ছিল যে এক গুলীতে বাঘকে ওখানেই ফেলব এ অহঙ্কার আমি কেন পৃথিবীর কোন লোকই করতে পারবে না, আর তোমার বন্দুকের হাতও আমার চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়।

কিন্তু আর দেরী করা উচিত নয়। দোজাকে তৈরী থাকতে বলে রায়ফেল তুললাম। যে অবস্থায় বাঘটা বসেছিল তাতে শুধু মাথা আর বুক ছাড়া আর কোথাও গুলী করবার উপায় নেই। মাথায় মারার প্রশ্নই ওঠেনা এ অবস্থায়। এক চুল এদিক ওদিক হলেই

গুলী লেগেও পিছলে বেরিয়ে যাবে। মারতে হবে বুকেই অর্থাৎ Frontal Chaste shot। এই গুলীতে রায়ফেলটা হওয়া দরকার একটু বেশী শক্তিশালী অথচ সেদিন আমার কাছে .২৭৫ বোরের রায়ফেল। কাজেই বাঘের গলাটা যেখানটায় এসে বুকের সাথে মিশেছে খুব সাবধানে সেখানটায় লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিলাম।

বাঘের লাফানো ঝাঁপানোর সাথে পরিচয় আছে। কিন্তু ও যে বসা অবস্থা থেকে একেবারে ঠিক পিছন পানে অতবড় লাফ দিতে পারে এটা সেদিনই প্রথম জানলাম। গুলীর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা গ্যাক্ করে আওয়াজ করে বাঘটা বিরাট একটা ডিগবাজী দিয়ে একেবারে পেছনের ঝোপঝাড় পার হয়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে পড়ল। আর পরেই এক তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল।

নিমেষে রায়ফেল বোল্ট করে খালি গুলীটা ফেলে দিয়ে নতুন একটা গুলী চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গান লাইটের আলোতে দেখছি জঙ্গল দুড়দাড় করে নড়ছে আর ভেতর থেকে প্রচণ্ড গর্জনের পর গর্জন। যে কোন মুহূর্তে বের হয়ে হা হা করতে করতে চার্জ করতে পারে।

কিন্তু কিছু হ'ল না। মিনিট কয়েক অমনি কাণ্ড কারাখানা করার পর চুপচাপ। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওখান থেকে খানিকটা সরে এসে বুদ্ধি আঁটতে লাগলাম কি করা যায়। কিছু দূরে একটা কুলি-বস্তি ছিল। জঙ্গলটা ঘুরে বস্তিতে এসে কয়েকজন লোক আর আগুন নিয়ে আবার গেলাম ওখানটায়। যেখানটায় ঢুকেছিল ওখানটায় গিয়ে বাইরে বাইরে থেকে যতটা সম্ভব দেখে কিছু টের পেলাম না। অগত্যা সে রাতের মত ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে বেরুবার আগেই আযীম ভাই একটা লোক নিয়ে এলেন, বললেন, মজার ব্যাপার শুনুন। প্রশ্ন করে শুনলাম ঐ লোকটা আর তার দু'জন সাথী ঐ জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা আছে ঐ রাস্তা দিয়ে গত রাত্রে আসছিল। হঠাৎ ওরা একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনল, আর তার পরই শুনল কি যেন একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গর্জন করতে করতে ওদের দিকে আসছে।

এমনিতেই তো ওদের পিলে চমকে গেছে। তার ওপর যখন মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার পাশ থেকে একটা বাঘ হা হা করতে করতে প্রায় ওদের মধ্যে এসে পড়েছে তখন যা হবার হয়ে গেছে। হাতের মশাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে যে যে দিকে পারে দৌড়ে পালিয়েছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। ভাগ্যিস বাঘটা কারো পেছন নেয়নি।

মনে পড়ল বাঘটা চুপ হবার একটু পরেই দূরে জঙ্গলের ওপাশ থেকে মানুষের সাড়া পেয়েছিলাম। তখন বিশেষ গা করিনি। ভেবেছিলাম রাত্রে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে ওরা গোলমাল করেছে। জিগ্যেস করলাম, 'তোমার সঙ্গী দু'জন কই?' একটু অভিযোগের সুরেই বলল যে তারা কোথায় কবিরাজের কাছে পানি পড়া খেতে গেছে খুব ভয় পেয়েছে বলে।

ঘটনাটা শুনে বুঝতে পারলাম। বাঘটাকে ফেলতে পরিনি। গুলী খেয়ে দৌড়ে জঙ্গল পার হয়ে ও ঐ লোকগুলোর মধ্যে গিয়ে পড়েছে আর তারপর কোন দিকে গেছে আল্লাহ জানে।

লোকটাকে সঙ্গে নিয়েই বাঘ খুঁজতে বেরুলাম। প্রথমেই গেলাম গত রাতের জায়গাটায়। জঙ্গলে ঢুকে বেশ আঁতিপাতি করে খুঁজেও কিছু পেলাম না। তারপর ওখান থেকে বের হয়ে গেলাম যেখানে লোকগুলোর সামনে বাঘ পড়েছিল। রাস্তার আশে পাশে দু'তিনটে মশাল পড়ে আছে। রাত্রে যেগুলো ওরা ছুঁড়ে ফেলে পালিয়েছিল। বাঘের পায়ের ছাপ পেলাম অবশ্য, কিন্তু ওটা অনুসরণ করে বেশী দূর যেতে পারলাম না, একটু পরেই ঘন জঙ্গলে ছাপ হারিয়ে গেল।

পড়লাম মুশকিলে। তারপর এ অবস্থায় যা একমাত্র করণীয় তাই করতে চেষ্টা করলাম, বাঘের চিন্তায় অনুসরণ, যে সম্বন্ধে প্রথম দিকে লিখেছি। জঙ্গলটা পার হয়ে এখানে হঠাৎ তিন জন লোকের সামনে পড়ে গেলে বাঘটা কোন দিকে যেতে চাইবে।

চারদিক ঘোরাঘুরি করে দেখলাম। মনে হ'ল উত্তর-পূর্ব দিক যাবার সম্ভাবনা বেশী। দোজাকে বললাম, 'সব দিকই সমান, চল এই দিকেই খোঁজা যাক।'

ওখান থেকে ঐ উত্তর-পূর্ব দিকে চলে প্রায় মাইল খানেক আসার পর হঠাৎ একটা জঙ্গল দেখে কি মনে হ'ল। দোজাকে বললাম, 'এটাকে একটু ভাল করে দেখতে হবে।' সঙ্গে যারা ছিল তাদের দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা দু'জনে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে দূরে জঙ্গলে ঢুকতে আরম্ভ করলাম।

ভাল করে ঢুকিওনি, তখন হঠাৎ একটা গর্জন আর ঝোপ ঝাড়ের আওয়াজ। এর ঠিক এক মুহূর্ত আগেও আমি দোজার দিকে একবার তাকিয়েছি। দেখেছি ও নিচু হয়ে বসে জঙ্গলের নিচ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। চম্‌কে বাঁ দিকে তাকিয়ে বাঘটার কিছু দেখতে পেলাম না অবশ্য, কিন্তু দেখলাম দোজা ছিটকে কয়েক হাত পিছিয়ে গেল।

দৌঁড়ে ওর কাছে গিয়ে শুনলাম ও নিচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করতেই বাঘটা গর্জন করে তেড়ে এসেছে, ভাগ্যিস বাইরে বেরিয়ে ওকে ধরে ফেলেনি।

বেশ একটু আশ্চর্য হলাম। আহত বাঘ, ও অবস্থায় তো শুধু তেড়ে এসে ভয় দেখাবার কথা নয়, একদম ধরে ফেলবার কথা, বিশেষ করে যে বাঘ প্রায় বিশ ঘণ্টা আগে আহত হয়েছে। এসব রহস্যের জবাব পেলাম অনেক পরে।

দেখলাম জঙ্গলটা ভেতরে ঘন, ঢোকার উপায় নেই। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এই ধরণের অবস্থায় প্রায় একমাত্র উপায় হচ্ছে হাতী। তখন হাতীই বা পাব কোথায়। মনের দুঃখে কথাটা বলে ফেলেছি। শুনে আযীম ভাই বললেন, ওখান থেকে মাইল কয়েক দূরে কার যেন একটা হাতী আছে চেষ্টা করলে হয়ত আনা যেতে পারে।

আমাদের দুটো হাতী; (বাঁ থেকে) মন্থরা ও তার মাহুত 'মনু মিয়া' এবং মহারাণী ও তার মাহুত 'নায়েব আলী'

শুনে লাফিয়ে উঠলাম, বলে কী! Lucky Break. কাল সকালের জন্য হাতীর ব্যবস্থা করতে রাত্রেই লোক পাঠাবার কথা স্থির করে ফিরে এলাম।

কিন্তু পরের দিন হাতী দিয়ে সে জঙ্গল তো বটেই তার আশ-পাশের সবগুলো সম্ভাব্য জঙ্গল তছ্নছ করেও বাঘের কোন পাত্তা যখন করতে পারলাম না, তখন বাধ্য হয়ে ওর আশা ছেড়েই দিলাম।

এ গল্পও এখানে শেষ নয়। ওর দিন দুই পরেই শিকার থেকে ফিরেছি, রাত্রে আযীম ভাই এসে বললেন, 'সুখবর দিচ্ছি। বাঘ তো পাওয়া গেছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, কতদূর গিছল ব্যাটা। জবাব শুনে গলা দিয়ে আমার আওয়াজ বেরুল না কতক্ষণ। বাঘ কোথাও যায়নি। সে রাত্রে গুলী খেয়ে বাঘটা উল্টা ডিগবাজী খেয়ে যেখানে যেয়ে পড়েছিল ঐখানেই মরে আছে। আজ দুপুরের দিকে এক রাখাল গরু চরাতে গেছে ঐ মাঠটাতে আর দুর্গন্ধ পেয়ে জঙ্গলে ঢুকে দেখে বাঘ মরে আছে। সে তখনই দৌড়ে খবর দিয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই গেলাম আর দেখলাম সত্যিই তাই। যেখানটায় ওকে গুলী করেছিলাম সেখান থেকে দশ গজও হবে না দূরে একটা ঝোপের নিচে একটু গর্তের মত, তারই মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে মরে আছে। প্রায় সম্পূর্ণ পঁচে গেছে এই তিন দিনে। বেশী কাছেও যেতে পারলাম না এত গন্ধ বেরিয়েছে। আমাদের ওকে খুঁজে না পাওয়ার কারণ প্রথমতঃ একটু গর্তের মত জায়গায় ঘন ঝোপের নিচে পড়েছিল, দ্বিতীয়তঃ ওর স্বাভাবিক ক্যামোফ্ল্যাজ।

পেলাম মানে, সম্পূর্ণ নয়, ভগ্নাংশ মাথাটা আর থাবাগুলো, কিন্তু বিচিত্র এক ধাঁধায় পড়ে গেলাম। ও বাঘ এখানে এল কি করে? বাঘ যে গুলী খেয়ে দৌড়ে বন পার হয়ে লোকগুলোর সামনে পড়েছিল তাতে তো আর ভুল নেই। তারপর তো আমরা নিজেরাও বাঘের সামনে গিয়ে পড়লাম। গুলী খাওয়া বাঘ যে আবার ফিরে যেখানে সে আহত হয়েছে সেখানে আসবে মরতে, এ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না।

অনেক চিন্তা, অনেক আলোচনার পর এ রহস্যের জবাব মিলল, আস্তে আস্তে এক টুকরা, দুই টুকরা করতে করতে। হয়েছে কি, প্রথমেই যখন বাঘটাকে দু'তিন বার দেখেছিলাম তখনই ভুল করেছিলাম। একটা বাঘকে দু'তিন বার দেখিনি। ওখানে বাঘই ছিল দু'টো, এক জোড়া।

একটা বাঘ যখন বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে মুখ করে বসল যতদূর সম্ভব পুরুষটা, তখন ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করিনি যে আরেকটা পেছনে জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে। গুলী খেয়ে লাফ দিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে আরেকটার ঘাড়ে, আর পড়েই কামড় দিয়ে ধরেছে ওকে। জন্তু-জানোয়ারের এ একটা স্বাভাবিক অভ্যাস, আঘাত পেলে কাছাকাছি যাকে পায় তাকেই কামড়ে দেয়। ঐ গোলমালই শুনেছিলাম আমরা বাইরে থেকে, কিন্তু কারণটা বুঝিনি।

যাই হোক সঙ্গীকে বা যতদূর সম্ভব সঙ্গিনীকে কামড়ে দিয়ে ও কয়েক পা গিয়েই মরে গেছে, আর এদিকে ঐ ভীষণ কামড় থেকে কোন রকমে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে অন্য বাঘটা বা বাঘিনীটা টেনে দৌঁড় লাগিয়েছে, আর ঝোঁকের মাথায় গিয়ে পড়েছে সেই লোকগুলোর মধ্যে। সেই খবর পেয়ে আমরা আসল বাঘ ত্যাগ করে ওর পেছনে পেছনে ধাওয়া করে সেই পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম; দু'টো বাঘের সম্ভাবনার কথাই কখনো মনে হয়নি।

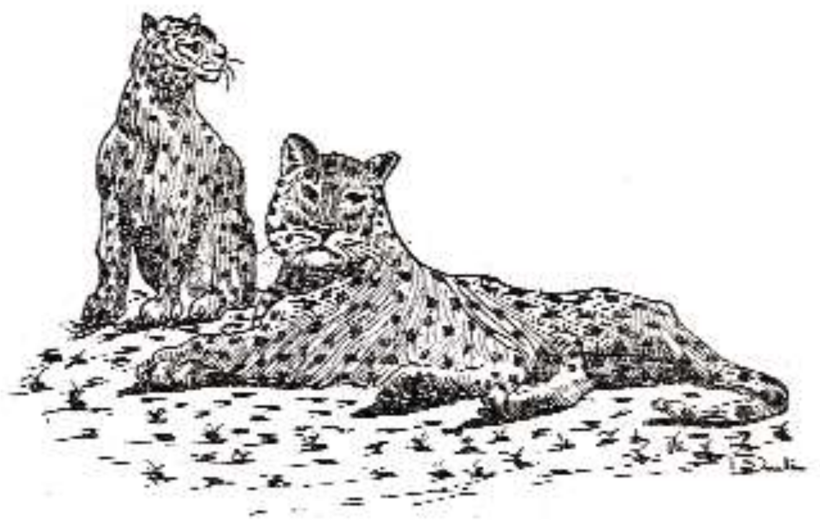

এগার

গর্তের শিক্ষা

এর আগে বোধ হয় একবার বলেছি যে ভাল করে শিকার না শিখে অন্ততঃ টেক্‌নিক্যাল দিকটা ভাল করে রপ্ত না করে একা একা শিকারে যাওয়া উচিত না। এর

উল্‌টা দিকটাও সত্য। অর্থাৎ কোন শিকারীরও উচিৎ নয় যে তিনি একদম কোন আনাড়ীকে নিয়ে শিকারে গিয়ে বিপদের ঝুঁকি নেন। এতে দু'জনেরই বিপদ হ'তে পারে। আমার একবারের অভিজ্ঞতা বলছি।

ঘটনাটা মাত্র সে দিনের, মানে গত বছরের আগের বছর। শিকারের সূত্র ধরেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, নামটা না হয় নাই বললাম। কোন বিখ্যাত ব্রিটিশ কোম্পানীর ঢাকা অফিসের ম্যানেজার। লোক পশ্চিমের। শিকার টিকারের দিকে খুব ঝোঁক। অর্ডার দিয়ে আমেরিকা থেকে নতুন মডেলের .৩০ স্প্রিংফিল্ড রায়ফেল আনিয়েছেন। ভীষণ সখ ঐ দিয়ে বাঘ মারবেন।

শিকারে শখ আছে বলে অল্প সময়ের মধ্যেই খানিকটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপরই আমাকে ধরে বসলেন তাকে যেমন করে হোক একটি বাঘ মারিয়ে দিতে হবে। সরলভাবেই স্বীকার করলেন যে কোনদিন বাঘ-টাঘ কিছু মারেননি। আলাপে আলাপে দেখলাম শিকার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে, আর শুয়োর শিকার করেছেন কয়েকটি। রায়ফেলের হাতও দেখলাম মন্দ নয়, কাজেই বেশ একটু বিশ্বাস হ'ল মনে। বললাম, 'ইনশা'আল্লাহ চেষ্টা করব।'

তারপর বহুবার তাকে নিয়ে শিকারে গেছি, বহু পরিশ্রম করেছি কিন্তু তাকে দিয়ে আর বাঘ মারাতে পারলাম না। ভদ্রলোকের নাম মনে করুন "ক"; মাঝে মাঝে এমনিতেও আসতেন, গল্প করতেন, আর আফসোস্ করতেন। বলতাম, 'কি আর করা যাবে বলুন। শিকারতো কপাল। আমি আমার শিকারের গাইডদের বলে রেখেছি বাঘের সন্ধান পেলেই আমাকে খবর দেবে। আপনি সবসময় একদম তৈরী থাকবেন। টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরী হয়ে চলে আসবেন।

আমি সত্যিই গাইডদের বিশেষ করে বলে রেখেছিলাম। হঠাৎ একদিন গাইড এসে খবর দিল, 'হুজর! বাঘে গরু মেরেছে।' তখন বিকাল তিনটে। অফিসে টেলিফোন করে "ক" কে পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেও রাত ৯ টার আগে তার পাত্তাই করতে পারলাম না। খবর পেয়েই তিনি উৎসাহে অস্থির হয়ে পড়লেন, তখনি যাবেন। বুঝিয়ে বললাম, যখন খবরটা পেয়েছিলাম তখনই রওয়ানা হলে হয়তো একটা কিছু করা যেত। আজকের মত আর কিছু করার নেই। কারণ গাইডের কাছ থেকে আমি খবর নিয়েছি। যেখানটায় মড়ি আছে সে জায়গাটা খুব ঘন জঙ্গল, আর কাছে কোথাও গাছ নেই। ঠিক এখন বাঘ বসে মড়ি খাচ্ছে। আমরা জঙ্গল ঠেলে ওখানে পৌঁছুবার অনেক আগেই ও সরে পড়বে। তার চেয়ে আগামীকাল যাব, ওকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু "ক" কিছুই শুনবেন না। 'না, চলুন আজ অন্ততঃ জায়গাটা দেখে আসি।' বহুত চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে না পেরে শেষে রওনা হতেই হ'ল।

মড়িটা ছিল আমাদের নিজস্ব বন এলাকায়। ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে রাত একটায় পৌঁছুলাম। প্রজাদের আর জাগালাম না। গাইডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজন সন্তর্পণে জঙ্গলে ঢুকলাম। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে চলেও বাঘের কানকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না জানতাম। ঠিক তাই। পৌঁছে দেখলাম বসে মড়ি খাচ্ছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়েছে আর পাঁচ দশ গজের মধ্যেই কোথাও বসে আমাদের দেখছে। কিছুই করার ছিল না।

ফিরে এলাম, বলে এলাম আগামীকাল দুপুরে আমরা আসব, জন দশ-বারো লোক যেন দা, কুড়াল, কোদাল নিয়ে তৈরী থাকে। আর বলে দিলাম কাল সকাল থেকে পাঁচ সাত জন লোক যেন মড়ি থেকে পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে বসে গল্প সল্প করতে থাকে আমার না আসা পর্যন্ত। ফেরার পথে রাস্তায় গাড়ীতে বসে চিন্তা করছিলাম। যায়গাটা যা দেখে এলাম তাতে কোন সন্দেহ রইল না যে এ বাঘটাকে মারা বেশ একটু বিপজ্জনক হবে। কাছাকাছি কোন গাছ নেই। মড়িটার চারদিক দিয়ে ভীষণ ঘন জঙ্গল। একমাত্র উপায়, এ অবস্থায় মাটিতে গর্ত করে বসা। তাই বা করব কোথায়। গর্ত করলে একটু দূরে করতে হয় অন্ততঃ ১০/১৫ গজ দূরে। ওখানে সে জায়গা নেই। আবার শিকারের এ সুযোগটা ছেড়ে দিতেও ইচ্ছা করে না। অনেক দিন পর একটা মওকা পাওয়া গেছে "ক" কে দিয়ে বাঘ মারাবার।

অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম একটু বিপদের ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে। ঠিক করলাম মড়িটার সোজা উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যে অতি সামান্য যে একটু ফাঁক আছে, ওই খানটায় গর্ত করে বসব। "ক" কে বললাম, আর কতকগুলো খুব জরুরী কথাও বিশেষ করে বলে দিলাম। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হ'ল যে, আমাদের লুকিয়ে থাকার ক্ষমতার উপর শিকার এবং নিরাপত্তা নির্ভর করবে; কারণ মড়ি এবং আমাদের গর্তের দূরত্ব চার পাঁচ গজের বেশী হবে না। একই সঙ্গে ওর অসম্ভব তীক্ষ্ণ চোখ, কানকে ফাঁকি দিতে হবে, আর প্রথম গুলীতেই ওকে ঐ ওখানেই ধরাশায়ী করতে হবে। "ক" কে বললাম, আমার ইশারা ছাড়া কিছু করতে পারবেন না। আপনি দু'ঘণ্টা ধরে নিশানা করুন কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু নড়াচড়া বা কোন আওয়াজ যেন একদম না হয়।

তারপর খানিকটা ভেবে বললাম, 'আর কাল আপনার .৩০ স্প্রিংফিল্ডটা আনবেন না, কাল একটা শট্‌গান আনবেন। এত কাছ থেকে রায়ফেলের গুলী খুব বেশী ক্ষতি কোরতে পারবে না, সাঁ করে পার হয়ে যাবে। এখানে শট্‌গানই ভাল কাজ করবে।'

আরও একটা কথা তাকে পই পই করে বলে দিলাম যে কথাটা এই বইয়ের প্রথম দিকে লিখেছি। বললাম, 'যখন গুলী করতে ইশারা করব তখন ঠিক কাঁধের পেছনে নিশানা করবেন। সাবধান, অন্য কোথাও না।'

সে রাত্রে গাড়ীতে বসে "ক" সব কথাতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন অবশ্য, কিন্তু পরের দিন যখন তিনি তৈরী হয়ে এলেন তখন দেখলাম শট্‌গান আনেনি, এনেছেন সেই .৩০ স্প্রিংফিল্ড। বললেন, 'শট্‌গানটা খারাপ হয়ে আছে।' ভাবলাম বোধহয় সত্যিই হবে।

যাই হোক সময়মত পৌঁছে দেখলাম সব ঠিক আছে।

আমরা রাত্রে চলে আসার পর বাঘ আবার এসে বেশ খানিক খেয়েছে। তবে আমার একটা আশংকা সত্য হয়নি। মড়িটাকে সরায়নি ওখান থেকে। যে লোকগুলোকে ২৫/৩০ গজ দূরে বসে গল্প করতে বলে গিয়েছিলাম তারা মাটিতে বসে গল্প করার বিশেষ উৎসাহ বোধ না করায় খুঁটি পুঁতে তার উপর ৮/১০ হাত উঁচু মাচান তৈরী করে তার উপর বসে গল্প করছে।

গর্ত করে তার চারধার দিয়ে পাতাসুদ্ধ ছোট ছোট ডাল পুঁতে জায়গাটা Camouflage করতে বেশ সময় লাগবে। জোড়াসন হয়ে বসলে বুক পর্যন্ত গর্তের মধ্যে থাকে এমনি করে গর্তটা করা হ'ল। সামনের ডাল পাতার মধ্য দিয়ে মাথা থেকে খানিকটা উঁচুতে দু'টো ফাঁক রাখলাম গুলী করার জন্য; "ক" কে বসালাম আমার ডাইনে। সব ঠিক ঠাক করে ভেতরে বসে যখন লোকজনকে বিদায় দিলাম তখন ঠিক ৫টা ১০ মিনিট, বেশ রোদ্দুর আছে যদিও অত ঘন বনের মধ্যে বসে আমরা শুধু গজারী গাছের মাথায় ছাড়া আর কোথাও রোদ্দুর দেখছিলাম না।

একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই একটা হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসেছিলাম। ডান হাতের কাছে গর্তের গায়ে ঠেস দিয়ে ১২ বোরের শট্‌গানটা রাখা ছিল। বাঘটাকে খুব শীগগীর মড়িতে আনার জন্য সারাদিন লোক রেখে দিয়েছিলাম যাতে দিনেই মড়ি খেতে না আসতে পারে। আশা করছিলাম সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়বে।

হঠাৎ "ক" আমাকে আলগোছে খোঁচা দিলেন। মুখ তুলে চাইতে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন যে এসেছে। এক্ষুণি। তারপর ভাবলাম কি দেখতে কি দেখেছেন ভদ্রলোক। এরকম সময় অনেকেই অনেক কিছুকেই বাঘ দেখে, এতো বহুবার দেখেছি। আস্তে আস্তে পাতার একটা ফাঁক দিয়ে তাকালাম। ও বাপ! সত্যি তো এসে পড়েছে। যেখান দিয়ে আসবে বলে মনে করেছিলাম ঠিক সেখান দিয়েই এসেছে। মড়িটার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছে লক্ষ্য করে কেউ আছে কিনা।

বাঁ হাত দিয়ে বন্দুকের fore-end টা ধরে ডান হাতে "ক" এর বাম কনুই এর কাছে চেপে ধরলাম অর্থাৎ নড়ো না। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালাম ৫টা ২৫। মাত্র ১৫ মিনিট হ'ল লোকজন গেছে, এতক্ষণে বোধ হয় বন পেরোয়নি।

বাঘটা তখন ভাল করে চারদিক লক্ষ্য করতে লেগেছে। উঁচু হয়ে, নিচু হয়ে, ডাইনে, বায়ে সব দিক দেখে সে নিশ্চিত হতে চাইছে এই যে এতক্ষণ এতগুলো লোক গোলমাল করছিল তারা সব গেছে না কেউ আছে। একবার একটু এদিক পানে এগিয়ে এল। বন্দুকটা চেপে ধরলাম। ওর দূরত্ব আমাদের থেকে বড় জোর পাঁচ গজ। ওকে দেখতে গেলে ওপর দিকে চেয়ে দেখতে হচ্ছে। পাথরের মত বসে আছি। একটু যদি আভাষ পায় আমরা আছি তবেই হয়েছে। বুকের মধ্যে এমন দড়াম্ দড়াম্ করছে যে মনে হচ্ছে বাঘেই শুনতে পারে এ আওয়াজ।

ওরই মধ্যে আমার আফসোস হচ্ছিল ক্যামেরার জন্য। এত কাছে থেকে কোনদিন বনের বাঘ দেখিনি। ওর প্রতি লোম পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। ছবি তোলার জন্য যথেষ্ট আলো আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পেতাম।

বেশ খানিকক্ষণ দেখে ও যখন নিশ্চিন্ত হ'ল যে, না কেউ নেই তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মড়িটার গলার যেখানটায় আগে খেয়ে গিছল সেখান থেকে আরও চামড়া ছেঁড়ার জন্য কামড়াতে লাগল। তখন দাঁড়িয়েছে আমাদের দিকে পাশ ফিরে অর্থাৎ Broad side, গুলী করবার খুব সুবিধা।

কিন্তু আমার তাড়াতাড়ি ছিল না। আরও বেশ কয়েক মিনিট খাওয়ার পর, যখন মনে হ'ল ও বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে তখন যে হাতে "ক" কে ধরে রেখেছিলাম তা খানিকটা আলগা দিলাম। আর চোখ দিয়ে ইশারা করলাম। এইবার খুব আস্তে আস্তে একটু উঁচু হয়ে নিশানা করুন। "ক" খুব আস্তে আস্তেই উঁচু হতে আরম্ভ করলেন; তারপরেই একটা মৃদু আওয়াজ; ওর প্যান্ট গর্তের পেছনের দেয়ালে সামান্য একটু ঘষা লেগেছে, আর এত সামান্য একটু আওয়াজ হয়েছে যে আমি গা ঘেষে বসে আছি তবুও ভাল

করে শুনিনি। কিন্তু বাঘের জন্য ওই যথেষ্ট, দেখলাম বিদ্যুতের মত ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের পানে তাকাল।

এমনি একটা কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম, খানিকটা থাকতেই হয়। “ক” কে নিচের দিকে টেনে ধরে পাতার ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইলাম। বাঘটা ঠায় চেয়ে আছে আমাদের পানে। মুর্তির মত নিশ্চল। দু’টি জিনিস ঘটতে পারে, হতে পারে ও দেখতে আসতে পারে আওয়াজটা কিসের হ’ল, আর নইলে সন্দেহ নিরশন হলেই আবার খেতে আরম্ভ করতে পারে। খেতে আরম্ভ করলে তো সব ঠিক আছে কিন্তু যদি তদন্ত করতে এদিকে আসে তবেই বিপদ হবে।

কিন্তু কী যে হ’ল, ও দু’টোর একটাও করছে না, শুধু ঠায় চেয়ে আছে। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড চলে গেল যদিও মনে হচ্ছিল পাঁচ মিনিটের কম হবে না। যখন পরিস্থিতি প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মড়িটার ওপর দিয়ে সড়াৎ করে ও পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। এক সেকেন্ডও এদিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, পরের সেকেন্ডে কেউ নেই ওখানে, ফাঁকা। যে নিজের চোখে না দেখেছেন তাকে বোঝান যাবে না কী অপূর্ব ওর গতি।

বাঘটার যাওয়ার ভাব দেখেই বুঝলাম যে আমাদের কাউকে দেখে গেল। আমাদের মানে “ক” কে কারণ আমায় দেখতে পায়নি, আমি নিশ্চিত ছিলাম। বোধহয় “ক” একটু মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন।

ইশারা করে বললাম, যা হবার হয়ে গেল এবার ফিরে চলুন। “ক” হাত নেড়ে বললেন, আবার আসবে। বললাম, আপনি জানেন না। আমরা যতক্ষণ এখানে থাকব বাঘ কিছুতেই আর আসবে না। তবু আরও কিছুক্ষণ বসলাম। ভেবে দেখলাম এরপরও যদি ফিরে আসেও তবু তাকে সামলাতে পারব না। কারণ Element of Surprise আর আমাদের পক্ষে নেই; বরং ও যদি আমাদের পেছন থেকে আসে তবে ওটা ওরই স্বপক্ষে হবে। তাই সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসার সাথে সাথেই গর্ত থেকে বের হয়ে চলে এলাম।

ভাবছেন, গল্প শেষ। কক্ষণো না; আসল কথাই বলা হয়নি। ব্যাপারটার দিন কয়েক পর “ক” কথায় কথায় বলে ফেলেছেন, ‘আপনি আমাকে কাঁধে গুলী করতে বলেছিলেন, কিন্তু সেদিন আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম গলায় গুলী করব।’ শুনে মাথার সব চুল খাড়া হয়ে গেল। পাঁচ গজ দূর থেকে .৩০ দিয়ে বাঘের গলায় গুলী। বুঝলাম সেদিন যে ভাগ্যের দোষ দিচ্ছিলাম তা নেহায়েৎ অন্যায় হয়েছে।

সেদিন ভাগ্য আমার ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল বলেই "ক" ঐ আওয়াজটা করে বাঘ তাড়িয়েছেন।

বার

অনুসরণ

গল্প বলা শেষ করার আগে দু'টো ঘটনার কথা বলি। তারপর একটু গবেষণা করা যাবে।

কত রকম ভাবে শিকারের সঙ্গে দেখা করা যায় তার যে একটা লিস্ট মত দিয়েছি এর আগে, ওগুলো ছাড়াও আরো একটা হচ্ছে Tracking– পায়ের ছাপ অনুসরণ করা, বোধ হয় মনে আছে। এটা আমাদের দেশে ব্যবহার প্রায় হয়ই না, কারণ আমাদের বন এত ঘন যে পায়ের ছাপ অনুসরণ করা প্রায় অসম্ভব। এই জন্য এদেশে এই Tracking করা শিকারী নেই। যতগুলো পন্থার কথা লিখেছি ওর সবরকমে আমি বাঘ মেরেছি কিন্তু এই Tracking করে আজও আমি কোন শিকার করতে পারিনি এদেশে।

Tracking সম্বন্ধে জানতে পারি প্রথমে বিদেশী শিকারীদের বই পড়ে। তখন মনে হয় আমরাও কেন এমনি করে শিকার করি না।

আব্বার সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি বললেন, 'ওটা ওদেশে সম্ভব। আমাদের Tropical জঙ্গলে পারা যাবে না।'

আমার কিন্তু মন মানল না। স্থির করলাম সুযোগ পেলে চেষ্টা করব। তারপর সুযোগও পেয়েছি, চেষ্টাও করেছি কিন্তু দেখলাম আব্বার কথাই ঠিক, এখানে সম্ভব নয়। একটা চেষ্টার কথা বলছি।

বন এলাকায় আমাদের বাংলোতে গিয়েছিলাম। শিকার করার উদ্দেশ্য ছিল না, গিয়েছিলাম বেড়াতে। আব্বাও ছিলেন। খবর এল বাঘে রাত্রে গরু নিয়ে গেছে।

খবরটা যখন এল তখন সকাল গোটা এগারো বাজে। বর্ষাকাল; আকাশ মেঘে ঢাকা, যে কোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। রাত্রে এক পশলা হয়েও গেছে। কিছুটা বিবরণ শুনে বুঝলাম এই ব্যাপারটায় Tracking চলতে পারে। আব্বাকে বলায় বললেন– 'চেষ্টা করে দেখতে পার– কিন্তু, খুব সাবধান।'

বাঘকে পেলে খুব কাছেই পাব জেনেও শট্‌গান না দিয়ে উইন্‌চেস্টারের .৩৪৮টা নিলাম। বেশী দূরে যেতে হ'ল না– বাংলো থেকে আধা মাইল দূরেই সে যায়গাটা। বন এলাকায় ধান রোপনের সময় আর কাটার সময় লোকেরা ক্ষেতের কাছে সাময়িকভাবে একটা ঘরের মত তৈরী করে নেয়, রাত্রে থাকার জন্যে। একে বলে 'ভাওর'। এই ভাওরের একটা অংশ বেড়া দিয়ে আলাদা করে তার মধ্যে এরা গরু, বাছুর, মোষ রাখে।

দেখলাম, এমনি একটা ভাওর– একটা চালা বা টিলার ওপর। ভাওরটার মাঝখান দিয়ে বেড়া দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা– এক পাশটা মানুষের, আর ও পাশটা গরু

বাছুরের। প্রশ্ন করে জানলাম, গত রাতে যথারীতি খাওয়া দাওয়া করে মানুষের পাশটায় সাত আটজন মানুষ আর গরুর পাশটায় দশ বারোটা গরু শুয়ে পড়ে। বেশী রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গে গরুগুলোর অস্থিরতায়। ওদের ভাল করেই জানা আছে, অত রাত্রে গরু দাপাদাপির একটা মাত্রই অর্থ আছে– আর তা হচ্ছে বাঘ। কাজেই এরা যথারীতি গোলমাল করতে আরম্ভ করে দেয়। সাধারণতঃ এই গোলমালে বেশ কাজ দেয়। কিন্তু কাল রাতে দেখা গেল এ পুরনো পদ্ধতি কোন কাজ করল না– কারণ একটু পরেই ও পাশের ডালপালার আড়াল ঠেলে ভেতরে ঢুকল একটা লেপার্ড, আর ঢুকেই ধরল একটা বড় বাছুরকে।

এপাশ থেকে এরা সব ব্যাপারটা দেখল। বাঘটা বড়জোর হাত ছয় সাত দূরে। বাঘ আর ওদের মাঝখানে শুধু পাতলা ধরণের একটা আড়াল মাত্র– ইচ্ছে করলেই ঠেলে চলে আসতে পারে।

আমার ঠিক মনে নাই ওরা ব্যাপারটা দেখছিল কি করে– চাঁদের আলোয় কি মশালের আলোয়। তবু এটুকু মনে আছে যে কেউ ঐ ভাওর থেকে বের হয়নি সে রাত্রে। বড় বাছুরটাকে মেরে ওটাকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওরা সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল।

দেখলাম বের হবার সময় বাছুরটা ভাওরের একটা থামে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু এত জোরে বাছুরটাকে টেনে বের কোরে নিয়ে এসেছে যে গজারীর খুটিটা ভেঙ্গে গেছে। লেপার্ডের গায়ের জোর সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও নূতন করে অবাক হলাম। প্রায় দেড় ফিট বেড়ের ভাঙ্গা থামটা তখনও মাটি থেকে ইঞ্চি ছয়েক উপরে ঝুলছে।

বাছুর বের করেই ও ঢালু গা বেয়ে নিচে নেমেছে– আর ছোট্ট বাইদটা পার হয়ে ওপাশের চালায় উঠে ঘন বনে ঢুকে গেছে। রাত্রের বৃষ্টিতে ভেজা মাটিতে পায়ের ছাপ অনুসরণ করার কোন অসুবিধা ছিল না। তাছাড়া বাছুরটার পিছন দিকটাও মাটিতে যথেষ্ট দাগ করে গেছে। ওপাশের চালায় উঠার সময় বললাম. 'বাছুরটা লাল রঙ্গের ছিল না?' ওরা ভারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি জানলাম কি করে? বাছুরের রং সম্বন্ধে তো কোন কথা হয়নি কখনো। নিচু হয়ে একটা গাছের মরা গুড়ী থেকে কতগুলো লোম উঠিয়ে দিয়ে দেখালাম। বাছুরটার গা থেকে লেগে রয়েছে।

ওখান থেকে কিছুদূর উপর দিকে উঠেই হঠাৎ বাঘটা ডান দিকে মোড় নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছে। এতক্ষণ বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গা দিয়েই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগুচ্ছিলাম, আর সঙ্গে পাঁচ ছয় জন লোক ছিল। আর নয়। এখান থেকে সবাইকে বিদায় দিলাম। কারণ এরপর আমাকে ঢুকতে হবে ঘন জঙ্গলে, সেখানে এত লোক সঙ্গে নিয়ে Tracking সম্ভব নয়। বলে দিলাম ঐ ভাওরে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে আর কোন রকম সোরগোল না করতে।

সামনের বনটা গজারীর। গাছগুলো বড় হয়নি। এই পনের বিশ ফিট মাত্র উঁচু হয়েছে, নিচটা নানা রকম আগাছা জঙ্গলে ভর্তি, যাও বা সামান্য ফাঁক ছিল তা অগুনতি সটি গাছ দিয়ে ঠাসা। আমার ঠিক সামনে ঐ সটি গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বাছুরটাকে টেনে নেওয়ার দাগ। গাছগুলো হেলে গিয়েছে, কোনটা শুয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা চিন্তা করলাম। এই জঙ্গলে কোন রকম শব্দ না করে চলা একদম অসম্ভব– অন্ততঃ আমার পক্ষে; অথচ Track করার আসল কথাই এই নিঃশব্দে চলা। আশে পাশে কোথাও বাড়ী-ঘর নেই, ভীষণ ঘন জঙ্গল, আর দিনটাও অন্ধকার– এমনি অবস্থায় অনেক সময় রাত্রের অপেক্ষা না করে বাঘ দিনেই বসে মড়ি খায়। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আমার উপস্থিতি ওকে কিছুতেই টের পেতে দেওয়া চলবে না। ঠিক করলাম--দেখা যাক কি হয়। খুব আস্তে আস্তে চলব, সময় যতই লাগুক। বাকী দিনটাতো হাতে আছেই।

বেশ সতর্ক হয়ে ঢুকলাম বটে, কিন্তু একটু এগিয়েই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে একেবারে নিঃশব্দে এই জঙ্গলে চলা অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব না। প্রতিবার পা ফেলতে দেখে দেখে ফেলছি। গাছের আর ডালের ফাঁক দিয়ে শরীর একদিকে কাত করে গলিয়ে সাবধানে পার হচ্ছি, প্রতি পায়ে কাঁটায় আটকে যাচ্ছি আর সাবধানে তা থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি– কিন্তু কিছু না কিছু শব্দ হচ্ছেই।

একমাত্র আশা যে ততক্ষণ ঝিরি ঝিরি করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বৃষ্টির আওয়াজে হয়ত আমার খুচ্ খাচ্ আর কাপড়ের ওপর দিয়ে ডালপাতা পিছলে যাবার সর সর শব্দ চাপা পড়তে পারে।

কিছুদূর গিয়েই দাগটা বা দিকে ঘুরে বনের আরও গভীর দিকটায় গেছে। অনুসরণ করে আরও কতদূর দিয়ে আটকে গেলাম।

এক বন থেকে অন্য বনে যাচ্ছি

সামনে দুর্ভেদ্য কাটা জঙ্গলের দেয়াল। সেটাকে ঠেলে নিচ দিয়ে বাঘটা বাছুর নিয়ে পার হয়েছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– কিন্তু ওর ভেতর দিয়ে আমরা পার হতে হলে একমাত্র উপায় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হাঁটা। তখন কেমন যেন অনুভব করছি আমি

মড়ি আর বাঘের থেকে বেশী দূরে নই। এখন মাটিতে শোয়া অবস্থায় হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ হওয়াটা অন্ততঃ আমার পক্ষে একটু লজ্জাকর--তাছাড়া সেই সামান্য ফাঁকটাও তখন আবার প্রায় বুজে এসেছে। ডাইনে বায়ে যতটুকু ঐ জঙ্গলের মধ্যে দেখা সম্ভব ঐ wait a bit–কাঁটার দেয়ালের শেষ দেখতে পেলাম না।

বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইত্যাকার চিন্তা করে হৃদয়ঙ্গম করলাম– হেরে গেছি। যেখান দিয়ে গিয়েছিলাম ওখান দিয়ে ফিরে এলাম– এবার সশব্দেই। যেখানটা থেকে সটির জঙ্গলে ঢুকেছিলাম সেখান থেকে কাঁটার জঙ্গলটা বোধ হয় ষাট কি সত্তর গজ হবে। এইটুকু যেতে আমার প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছিল।

বের হয়ে এসে ভাওর থেকে এদের নিয়ে কাঁটার দেয়ালটা দা দিয়ে কেটে রাস্তা করলাম। ও পাশে পার হয়ে গজ পনেরো পরেই দেখি মড়ি পড়ে আছে।

পাকিস্তান হবার একটু আগে কি পরে ঠিক মনে নেই। সেবার শিকারে আমার সঙ্গে ছিলেন মহাকুমা পুলিশ অফিসার (এস.ডি.পি.ও.)। এখন তিনি একজন ডি.আই.জি.। বিশেষ কোন খবর না থাকায় আমরা রোজই বিকালে বক্রি Bait দিয়ে বাঘের আশায় বসতাম, আর রোজই খালি হাতে ফিরতাম।

এমনি একদিন বসতে গিয়েছি– ক্যাম্প থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জায়গাটার সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলাম না। মোটামুটি ভাল গাছ পেলে আমি আর মাচান বাঁধার হ্যাঙ্গামা করতাম না। সেদিনও একটা লম্বা বাইদের একধারে একটা বেশ সুবিধামত গাছ পেয়ে সেখানে বসা ঠিক করলাম। এস.ডি.পি.ও সাহেবের বসার জন্য দু'তিন'শ গজ দূরে আরেকটা গাছ ঠিক হ'ল।

ভালমতে পরীক্ষা করে না নিয়ে আমি সাধারণত কাউকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বসা পছন্দ করি না। কিন্তু এস.ডি.পি.ও. সাহেবেরে জোরাজুরিতে ওর পশ্চিমা বডিগার্ডটাকে সঙ্গে বসালাম– সব নিয়মকানুন বাতলিয়ে দিয়ে।

আমাদের সামনের বাইদের ওপাশেই একটা চালা অর্থাৎ টিলা। সন্ধ্যার একটু আগেই শুনি চালাটার ঢালু গা বেয়ে বনের ভেতর দিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে কয়েকজন লোক যাচ্ছে। এত বনের ভেতর বক্রির চ্যাঁচানো শুনে ওরা অবাক। শেষে গবেষণা করে স্থির করল, কেউ চরতে দিয়েছিল, তারপর নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই শুনি আরো কয়েকজন যাচ্ছে। সেই আগেরবারের পুনরাবৃত্তি–

কোন বোকারাম বক্‌রি ভুলে এই বনে ফেলে চলে গেছে, এক্ষুণি বাঘে খাবে। তারপর শুনি আরেকদল।

ওরা চলে যাবার পর আরেকদল। ব্যাপার বুঝলাম; কাছাকাছি কোথাও হাট আছে আজ। চালাটার ভেতর দিয়ে যে পায়ে হাঁটা পথ আছে আগে বুঝিনি– ঐ পথ দিয়ে হাট-ফেরৎ লোকজন বাড়ী ফিরছে। বনের পথে সন্ধ্যায় বা রাত্রে একা চলাফেরা সুবুদ্ধির কাজ নয় বলে ছোট ছোট দল বেঁধে যাচ্ছে। বুঝলাম শিকারের আশায় বালি, ভাল করে না দেখে শুনে বসতেই ভুল হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অনেক পর পর্যন্ত এরা এমনি যেতে থাকবে।

লাভ নেই জেনেও বসে রইলাম। এস.ডি.পি.ও সাহেব যেখানটায় বসেছিলেন সেদিকটা বেশ দূর– আমার এখানে বাঘ না আসলেও তার দিকে সম্ভাবনা ছিল। কাজেই চুপচাপ বসে হাট ফেরৎ লোকদের বক্‌রি সম্বন্ধে রিসার্চ শুনতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে এল আস্তে আস্তে।

হঠাৎ একটা ইন্টারেস্টিং আলোচনা কানে এল। দু'জন লোক। বক্‌রির ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর যখন নিশ্চিত হ'ল যে কেউ সত্যি বক্‌রি চরতে দিয়ে বেমালুম ভুলে গেছে তখন একজন বলল, 'এই চল্‌ এটাকে নিয়ে যাই।'

একজনও ভাললোক পৃথিবীতে না থাকা পর্যন্ত ক্বেয়ামত হবে না। তক্ষুণি বুঝলাম কেন ক্বেয়ামত হচ্ছে না, কারণ তার সঙ্গী বলল– 'আরে দূর! কার না কার বক্‌রি, না বলে নিয়ে যাবি? চল্‌, চল্‌, রাত হয়ে আসছে।' কিন্তু এ পরামর্শ প্রথম জনের মোটেই পছন্দ হ'ল না। তর্ক করতে করতে ওরা পথ ছেড়ে চালার প্রান্ত পর্যন্ত এল; দাঁড়িয়ে বক্‌রিটাও দেখল খানিকক্ষণ– কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম যাদের জন্য ক্বেয়ামত হচ্ছে না তাদেরই একজন জিতল।

ওরা চলে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর আবার দু'জনের সাড়া পেলাম। এবারেও ওরা দাঁড়িয়ে গেল। বক্‌রিটাও দেখলাম লোকজনের সাড়া পেলেই আরও বেশী করে চ্যাঁচাচ্ছে– অর্থাৎ আমি এখানে একা জঙ্গলে পড়ে আছি, তোমরা কেউ এসে আমাকে নিয়ে যাও। যাই হোক, সেই আগের মত ব্যাপার। কে এমন করে এই জঙ্গলে বক্‌রি রেখে গেছে। তারপরই সেই ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্ব। এবার চাচা আর ভাতিজা।

'চাচা! চল এটাকে নিয়ে যাই।'

'আরে না না। কার না কার বক্‌রি। ওসবে কাজ নাই, চল্‌।' বলে চাচা কয়েক পা এগুলো। ভাতিজা কিন্তু দেখলাম তার নীতিতে দৃঢ়। সে এগুলো না। বলল, 'তুমি বুঝ না চাচা। এ বক্‌রি কি আর বাঁচবে মনে করেছ? আমরা চলে গেলেই তো বাঘের পেটে যাবে। কারু ভাগ্যে লাগবে না। তার চেয়ে চল নিয়ে যাই।'

চাচা আমতা আমতা করতে লাগল– 'কিন্তু যদি হঠাৎ ধরা টরা পড়িস তাহলে?' 'আরে দূর! তুমিও যেমন। হাট থেকে ফিরছি, বক্‌রি তো সেখান থেকে কিনে আনলাম। তারপর চাচাকে একটু তোয়াজ করে বলল–'কিছু ঘাবড়িও না– কয়েকদিন পরই তো ঈদ। কোরবানী করে দেব।'

সত্যিই মাত্র তিন চারদিন পরই ঈদ-উল-আযহা। মস্‌লা মাসায়েলের আওতার বহু বাইরে কোরবানীর এমন প্রকৃষ্ট পন্থা জানতে পেরে আমি এমন বে-করার হয়ে পড়লাম, যে চাচা-ভাতিজা জঙ্গল পার হয়ে কখন যে এ পাশে এসে পড়েছে ইতিমধ্যে, টেরই পাইনি। সম্বিৎ ফিরে আসতে দেখি বডিগার্ডটা চেঁচাবার উদ্যোগ করছে। হাত দিয়ে ইশারা করে ওকে চুপ করে থাকতে বললাম। দেখি কতদূর দৌড়।

চাচা জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাতিজা বাইদটার ওপর দিয়ে এগুতে লাগল। তারপর বক্‌রিটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিচু হয়ে খোটায় হাত দিল। আর দেরী করার দরকার ছিল না। রায়ফেলে লাগানো গান লাইটটা জ্বাললাম সোজা ওর মুখ লক্ষ্য করে।

ভাতিজা– যে বক্‌রিটাকে নিয়ে চম্পট দেবার যো করছিল, ওটাকে কোরবানী দেবার সময় যে রকম আওয়াজ বেরুতো অনেকটা সেই রকম একটা আওয়াজ বেরুল তার গলা দিয়ে। তবু ওরই মধ্যে তিনটা শব্দ বুঝতে পারলাম– 'চাচা গো! ইডা কী?'

আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পারলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াতো জানি না, কারণ সব ভণ্ডুল করল বডিগার্ডটা। সামলাতে না পেরে হঠাৎ সে ভীষণ গালাগালি আরম্ভ করে দিল। পুলিশের গালি-গালাজ নাকি পৃথিবী বিখ্যাত, এ প্রবাদটাই শুনে এসেছি। সেদিন হাতে হাতে তো নয় কানে কানে প্রমাণ হয়ে গেল। বাংলা ভাল করে বলতে পারে না, কিন্তু গালগুলো যা রপ্ত করেছে তা নিখুঁতেরও উপরে আর এক ডিগ্রী, গাল শুনে মনে হচ্ছিল গাছ থেকে পড়ে যাব−−আর না শোনারও কোন উপায় নেই কারণ যা বলছে তা তারস্বরেই বলছে, আর তার মুখ আমার কান থেকে এক ফুটেরও বেশী দূর নয়।

দৃশ্যটা মন্দ নয়। দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারের মধ্যে বাইদের উপর দিকে একটা লোক পড়ি কি মরি করে ছুটছে, কারণ গাল শুনেই ভাতিজা বুঝেছে যে গাছের ওপর লোক, আর দৌড় লাগিয়েছে− তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে একটা মুর্তিমান গাল−−খাস পুলিশী গাল।

চাচা যে কোন দিকে হাওয়া হ'ল তার আর কোন পাত্তাই পেলাম না। কথায় বলে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। শিকারের যে ইতি সে তো আর বলার দরকার করে না।

তের

দু'টো ঝাল

পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা অনেকেরই অভ্যাস। কাজেই যে জাতি বহুদিন পরের অধীন হয়েছিল সে যে বেশী করে কর্তার মুখে ঝাল খাবে এটাই স্বাভাবিক। কর্তা চলে গেলেও তাকে গুরুর আসন থেকে এখনও নামাইনি। তাই ঝাল আমরা আজও তারই মুখে খাই। সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ইত্যাদি বহুবিধ ঝালের মধ্যে আমার আওতার মধ্যেকার দু'টো ঝাল সম্বন্ধে বলতেই হচ্ছে--নেহায়েতই যখন লিখতে বসেছি। বনের সিংহাসন, আর সুন্দরবন।

স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলে থেকে এক ধরণের শিকারী পর্যন্ত যাকে জিজ্ঞেস করবেন– 'বনের রাজা কে?' সেই বলবে– 'কেন? সিংহ।' সব ঝাল খেয়েছে।

অবশ্য সিংহাসন শব্দটার ভাষাগত অর্থ ধরলে সিংহের আর গদিচ্যুতির আশংকা থাকে না। তার অধিকার চিরতরে কায়েম হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর বনের রাজার আসন কে পাবে তা নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সিংহ তার সিংহাসনে থাকতে পারে না। বনের রাজা বাঘ। সব বাঘ নয়– রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

দেখা যাক।

এ বিচারে প্রথমে হ'ল শারীরিক দিক। আফ্রিকার একটা সাড়ে-নয় ফিট সিংহ খুব বড় সিংহ। সাড়ে-দশ ফিট বেঙ্গল টাইগার বেশ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। তার উপরও পাওয়া যায়। বার ফিটের উপরও বাঘ মারা পড়েছে বলে প্রমাণ আছে। এগার ফিট সিংহের কোন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া শরীরের মাপে আর ওজন অর্থাৎ massiveness-এও বাঘ বেশী নম্বর পাবে। একটা ভাল সাইজের সিংহের ওজন চার থেকে সাড়ে চার শত পাউন্ড আর একটা ভাল সাইজের বাঘ সাড়ে পাঁচশত থেকে ছয় শত পাউন্ড হয়। তারপর শক্তি।

এ ব্যাপারটা বলা মুশকিল এই জন্য যে কে বেশী শক্তিশালী তা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে সমান আকারের বাঘ আর সিংহের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দেখতে হবে কে জেতে। একবার দুবার নয়, বেশ কয়েকবার যেমন করে আমরা বক্সিং-এ কে চ্যাম্পিয়ন তা ঠিক করি। তবে আমার জানার মধ্যে এমনি একটা লড়াই একবার

ইউরোপে হয়েছিল। তাতে সিংহটা ছিল পুরো সাইজের আর বাঘটা ছিল ছোট। আর আমি প্রায় নিশ্চিত যে বাঘটা শুধু টাইগার ছিল– অর্থাৎ ভারতের বাঘ ছিল– বাংলার রয়াল বেঙ্গল টাইগার নয়। যা হোক তবুও লড়াই সমান সমান অর্থাৎ ড্র হয়েছিল। কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। এ তো গেল শারীরিক দিক।

এরপর সাহস। এইবার সিংহের আশা নেই। সিংহের চেয়ে বাঘের সাহস অনেক বেশী। যেখানে হেরে যাবার সম্ভাবনা আছে সেখান থেকে সিংহের পিছটান দেবার অভ্যাস আছে---বাঘ কক্ষণো দেবে না, তা সে যত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীই হোক। বাঘ আর সিংহ শিকারের উপায় অর্থাৎ প্রণালী থেকে আঁচ করা যায়--শিকারী কাকে বেশী খাতের খাতির করেন। কথাটা বুঝিয়ে বলছি।

আফ্রিকায় সিংহ শিকারের চিরাচরিত প্রথা হচ্ছে এই---বিকালের দিকে আপনি একটা মাঝারি বা ছোট রায়ফেল নিয়ে Veldt--এ বেরিয়ে যান। কিছুক্ষণ ঘুরলেই আপনি জেব্রা বা যিরাফ বা ন্যূ বা এন্‌টেলোপ হরিণের দেখা পাবেন। দূর থেকেই গুলি করে একটা মারুন। কাছে যাবারও দরকার নেই। জায়গাটা বেশ করে মনে রাখুন--তারপর ক্যাম্পে ফিরে এসে ঘুম দিন।

পরের দিন সকালে গাইড আর বন্দুক বইবার লোক সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যান। আগের দিন যেখানে ওটাকে মেরেছিলেন সেখানে পৌঁছুবার কয়েকশত গজ দূরে থাকতেই সাবধান হয়ে যান। কোন রকম সাড়া শব্দ না করে পা টিপে টিপে ওদিক পানে এগুতে থাকুন। শতগজ দূরে থাকতেই দেখতে পাবেন অপূর্ব দৃশ্য। আপনার মারা শিকারটাকে মাঝখানে রেখে অন্তত ছ’ সাতটা সিংহ সিংহী আরাম করছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ সারারাত খেয়ে পেট মোটা করে হাসি হাসি মুখ করে অন্যের খাওয়া দেখছে। কেউ চার হাত পা ছাড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

এবার দূরবীনটা বার করে ভাল করে দেখুন কার কেশর সবচেয়ে ভাল আর বড়। বেছে নিলেন তো একটা; এবার দূরবীন রেখে রায়ফেল নিন। রায়লেফটা ঠেস্ দিয়ে ধীরে সুস্থে আরাম করে নিশানা করে মেরে দিন।

মেরে দিয়েই আপনি চম্‌কে যাবেন। আপনিতো দূরবীন দিয়ে ছয় সাতটা সিংহ দেখেছিলেন। এখন দেখবেন আপনার বন্দুকের আওয়াজের সাথে সাথে ওখান থেকে এক ডজন সিংহ সিংহী লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপরই দেখবেন আপনার সিংহটা মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়ছে আর বাকী সবগুলো যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে--ওর মধ্যে খুব সম্ভব আপনি অন্ততঃ আরও দুটো সিংহ দেখতে পাবেন যারা

আপনি যাকে বড় কেশরওয়ালা মনে করে মেরেছেন তারচেয়েও বড় কেশর নিয়ে পালাচ্ছে। আপনার হাত যদি পাকা হয় তবে সবগুলো অদৃশ্য হবার আগেই আরও দুই তিনটাকে ফেলে দিতে পারবেন।

এই হ'ল আফ্রিকার সিংহ শিকারের সাধারণ প্রণালী। আজও যদি আপনি আফ্রিকায় যান তবে White hunter বা Guide আপনাকে এমনি করেই শিকার করাবে। এবার এর সঙ্গে আমাদের বাঘ শিকারের তুলনা করলেই কার সাহস কতখানি তাতে আর সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকবে না।

প্রথমতঃ এতগুলো বাঘের মুখোমুখি হবার প্রশ্নই ওঠে না; কারণ বাঘ সিংহের মত দল বেঁধে থাকেই না; সিংহ প্রায় সব সময়ই দল বেঁধে থাকে। এটাও সাহসের একটা প্রমাণ– কারণ, দল বাঁধাই হয় নিরাপত্তার জন্য। দ্বিতীয়তঃ বেশী নয়– দুটো বাঘ একত্রে পেলেই বুদ্ধিমান শিকারী চুপ করে থাকেন– বন্দুক ওঠান না। কিংবা মানে মানে সরে পড়েন।

বেশ কিছুদিন আগে দাদা একবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আচ্ছা বল্‌তো! দু'টো বাঘ যদি একত্রে পাস তবে কি করবি?' তখন শিকার সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু চিন্তা করেও এটার জবাব পেলাম না। তখন দাদা বলে দিলেন, '--বাঘ যদি তোকে দেখে ফেলে থাকে তবে গুলীই করবি না। আর যদি না দেখে থাকে বা তুই নেহায়েৎ নিরাপদ জায়গায় থেকে থাকিস তবে গুলি করতে পারিস---তবে প্রথমেই বাঘিনীকে, কক্ষণো বাঘকে প্রথমে মারবি না।' কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, 'বাঘিনীকে গুলি করলে বাঘ চমকে উঠে চলে যাবে এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বাঘকে গুলি করলে বাঘিনী Charge করবেই।' মনে মনে ভাবলাম, The female of the species.

কিন্তু এসবের চেয়েও একটা বড় প্রমাণ আছে বাঘের সাহসের– আর সেটা বোঝা যায় যখন বাঘ আর সিংহ man-eater বা মানুষখেকো হয়ে দাঁড়ায়। বাঘ, সিংহ কোন কোনটা মানুষখেকো হয় কেন তা পরে বলা যাবে– সুন্দরবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে। বাঘ মানুষখেকো হলে দিনে মানুষ ধরে। লেপার্ড মানুষখেকো হলে মানুষ ধরে রাত্রে ঘরে ঢুকে। এর কারণ হ'ল--বাঘ কাউকে ভয় করে না, যে মানুষকে আর সবরকম জীব-জন্তু ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে, তাকেও না। তাই যখন সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে তখন তার আওতার মধ্যে অর্থাৎ বশে মানুষ পেলে সে রাতই হোক আর দিনই হোক, তাকে ধরে বসে--কোন পরওয়া করে না। আর লেপার্ড মানুষখেকো হলেও

তার মানুষ সম্বন্ধে ভয় দূর হয় না---কারণ তার সাহসই বাঘের চেয়ে কম। তাই দিনে সে বনে মানুষ পেলেও তাকে ধরতে সহস করে না---রাত্রে চুপে চুপে এসে অসতর্ক বা ঘুমন্ত মানুষ ধরে নিয়ে যায়।

এবার সিংহের কথায় আসা যাক। মানুষখেকো সিংহ দিনে মানুষ ধরে না– ধরে রাতের অন্ধকারে। অথচ সে লেপার্ডের চেয়ে আকারে এবং শক্তিতে বড়। সাহসের অভাব ছাড়া এর আর কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। আমার মনে হয় সাহস আর শক্তিতে সিংহের মত হলে আমাদের দেশের লেপার্ড দিনে মানুষ ধরত। গর্ডন কামিং ঘোড়ায় চড়ে রায়ফেল নয়, বন্দুক নয়, শুধু মাত্র একটা রিভলবার নিয়ে আহত সিংহকে তাড়া করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে গুলিও করেছিলেন। সিংহ না হয়ে বাঘ হলে কামিংকে ফিরে এসে বই লিখতে হত না। তারপর মেজাজে, চলাফেরায় বাঘের যে রাজকীয় ভাব আছে তা সিংহের চেয়ে বেশী। আর সৌন্দর্য্যের তো কথাই নেই।

বাবার একই দিনে শিকার করা দু'টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার, একটা বাঘ, আরেকটা বাঘিনী

বিনা কারণে অর্থাৎ খিদে না পেলে জীব হত্যা করে না বলে সিংহের যে একটা বিশেষ গুণ আছে বলে বলা হয় সে গুণটা বিশেষ নয়––খিদে না পেলে কোন বন্য জন্তুই অন্য জন্তুকে মারে না। বাঘও না। তবে একটা সময় আছে যখন সে নির্বিচারে জীব হত্যা করে। সেটা হ'ল যখন বাঘিনী তার বাচ্চাদের শিকার শেখায়। কেমন করে শিকারকে লক্ষ্য করতে হয় কেমন করে তাকে Stalk করতে হয়, তারপর কেমন করে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ধরতে হয়। এ শেখাতে গিয়ে তাকে বেশ কিছুটা জানোয়ারের জান নিতে হয়। একে আমি বিনা প্রয়োজনে হত্যা বলব না। এও এক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনে সিংহীও অনেক জান মারে বলে আমার মনে হয়––যদিও এটা আমার সন্দেহাতীতভাবে জানা নেই।

এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন এতই যদি প্রমাণ থাকে তাহলে সিংহ কি করে বনের রাজার আসন পেল? কারণ আছে।

সিংহের বাস আফ্রিকায় আর মধ্যপ্রাচ্যে। অবশ্য অনেক আগে ইউরোপে আর পশ্চিম ভারতের মরুভূমির দিকটাতেও ছিল; কিন্তু সে কথার দরকার নেই। ইউরোপীয়ানরা সভ্য হবার পর বাড়ীর কাছেই মধ্যপ্রাচ্যে আর আফ্রিকায় দেখা পেলেন সিংহের--নাম দিলেন বনের রাজা। এক দিক দিয়ে ঠিকই হ'ল--কারণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার তারা তখনও দেখেননি, আর রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে বাদ দিলে সিংহাসন সিংহ ছাড়া আর কেউ পায় না এ কথা আমি মানি। তাই তাদের দেওয়া নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে--গল্পের কাহিনী আর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

ভুল ভাঙ্গল অনেক পরে। যখন তারা পৃথিবীতে ছড়াতে ছড়াতে এই বঙ্গদেশে এসে পড়লেন, এসে এদেশের বাঘ দেখেই তো তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন কী ভুলটা করেছেন সিংহকে বনের রাজা বানিয়ে। তখন দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের আমি শ্রদ্ধা করি; কারণ অত দেরীতেও ভুলটা শোধরাবার চেষ্টা তারা করতে দ্বিধা করেননি। এমনকি দাবীটা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা বাংলার বাঘের নামের আগে Royal--রাজকীয় শব্দটা লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশেষ ফল হ'ল না। বিশেষজ্ঞেরা মেনে নিলেন, কিন্তু সাধারণের মধ্যে সিংহই রয়ে গেল রাজাসনে। ঐ ঝাল। বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ শিকারীদের মধ্যেই ভেদাভেদ রয়েছে। বেশীই হলেন তারা, যারা ঐ দিকেই শিকার করেছেন– বাঘ দেখেননি। তাদের চেয়ে যারা এদিকে বাঘ শিকার করেছেন তাদের সংখ্যা কম। আর সবচেয়ে কম সংখ্যা হলেন যারা সিংহ বাঘ দুই-ই মেরেছেন। এদের কাছে সিংহকে বনের রাজা বললে তারা মারতে আসবেন।

আরও ছোটখাট কারণ আছে; কিন্তু খুটিনাটি বাদ দিলে মোটামুটি এ কয়টি কারণ থেকেই যথেষ্ট বোঝা যায় যে বনের রাজা আফ্রিকার সিংহ নয়– আমাদের দেশের বাঘ– অন্যে যে যাই বলুক অন্তত আমার নিজের দেশের মানুষদের– আমাদের উচিৎ তার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করা। এবার চলুন দু'নম্বর ঝাল সুন্দরবন।

আফ্রিকা। পৃথিবীর শিকারীদের স্বপ্নপুরী। এডভেঞ্চার যারা চান তাদের জন্য মহাতীর্থ। ইউরোপ আর আমেরিকার কোটিপতিরা টাকা কামাতে কামাতে যখন বিতৃষ্ণ হয়ে যান, তখন এই অফ্রিকাতেই তারা ছোটেন বৈচিত্রের খোঁজে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকটায়ও প্রতি বছর পঁচিশ হাজার হাতী তাদের জান আর দাঁত দিয়েছে মানুষকে। হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে আফ্রিকার শিকার নিয়ে।

এমনি মহা-বিখ্যাত বিরাট আফ্রিকার সঙ্গে আমি তুলনা করব আমাদের দেশের অবজ্ঞাত অখ্যাত ছোট্ট সুন্দরবনকে। অবশ্য আয়তন আর শিকারের সংখ্যা ধরলে আফ্রিকা তার নিজের জায়গাতেই থাকবে– যেমন নাকি সিংহাসন শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরলে আর যুক্তি তর্কের কিছু থাকে না। কিন্তু শিকারী জীবনের আসল অর্থ ধরলে দেখবেন সে কতগুলো প্রাণ বধ করেছে--এটা মুখ্য নয়, মুখ্য হ'ল সে কতবার কতখানি সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি হয়েছে--মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনকে উপলব্ধি করেছে। তাই যদি শিকারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে--অন্ততঃ আমার কাছে তাই--তবে আফ্রিকা কেন, পৃথিবীর কোন শিকারের জায়গারই সুন্দরবনের সঙ্গে তুলনা হয় না।

জানি কথাটা অনেকের কাছেই পছন্দ হ'ল না! দোষ নেই। ঝালের স্বাদ সহজে যায় না। চলুন দেখা যাক।

প্রথমেই ধরুন শিকার করার উপায়টা। খানিকটা এ সম্বন্ধে বলেছি এর আগে। আরও একটু বলছি।

আফ্রিকার বড় বড় শহরে পেশাদার শিকারীরা থাকেন। এদের জীবিকাই হ'ল শিকার। এদের Association--সমিতিও আছে। এরা সব সাদা চামড়ার– তাই তাদের নাম হয়েছে white hunter--সাদা শিকারী। যিনি শিকারে যাবেন তিনি এই রকম কোন সমিতির কাছে চিঠি লিখলেই তারা একজন শিকারীকে নিযুক্ত করবেন তাকে শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সেখানে পৌঁছুবার পর হোয়াইট হান্টার তাকে জিজ্ঞেস করে লোকজন, গাড়ী ইত্যাদি ভাড়া করবেন। একে বলা হয় Safari. জিজ্ঞেস করবেন এই জন্য যে কতবড় সাফারী হবে, তাতে কতজন লোক থাকবে। কতগুলো গাড়ী থাকবে, কি কি রশদপত্র থাকবে– এ সব নির্ভর করবে আপনার পয়সার ওপর। খুব সস্তায়ও সারতে পারেন, আবার বিরাট সাফারী ও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন। আগে সাফারী শুধু পায়ে হেঁটেই হত এখন জীপ, ল্যান্ডরোভার আর পিকআপ, ট্রাক এইসব নিয়ে তৈরী হয়। আমি একজন ইউরোপিয়ান বড়লোকের সাফারীর বৃত্তান্ত পড়েছিলাম; তাতে তার সাফারীতে সব ধরণের আরামের বন্দোবস্ত ছিল। ইলেকট্রিক তৈরী করার জন্য ডায়নামো, রেডিও, রিফ্রিজারেটর, কাস্ক (Cask) ভর্তি মদ, আর তার ওপর ছিল বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য রেডিও ট্রান্সমিটার।

যাই হোক সাফারী তৈরী হলে সবাই রওনা হয়ে পড়বেন। হোয়াইট-হান্টার আগেই টাকা জমা দিয়ে শিকারের লাইসেন্স নিয়ে রেখেছেন– তাতে লেখা আছে কতগুলি হাতী, গণ্ডার আর সিংহ মারতে পারা যাবে। হোয়াইট হান্টারের নখদর্পনে সব আছে– ঠিক কোথায় কি পাওয়া যাবে।

জায়গামত পৌঁছে তাবু ফেলে ক্যাম্প করে হোয়াইট-হান্টার, রায়ফেল বইবার জন্য দু'চারজন নিগ্রো আর শিকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। অচিরাৎ শিকারের দেখা পাওয়া যাবে। হোয়াইট-হান্টারের নির্দেশমত লক্ষ্য স্থির করে শিকারী গুলি করবেন। কোন ভয় নেই– তার ভাল বন্দুকবাজ হবারও দরকার নেই। গুলী করার পর যা ঘটবে তা সামলাবেন হোয়াইট-হান্টার। শিকার যদি আহত হয়ে জঙ্গলে ঢোকে তবে শিকারী যাবেন না– যাবেন হোয়াইট-হান্টার, এই জন্যই না তাকে এতগুলো টাকা দিয়ে আনা হয়েছে। অনেক সময় এমনও হয় যে গুলীর পর গুলী ফস্‌কে যাচ্ছে, ফেরার সময় হয়ে এল, অথচ লাইসেন্সের কতগুলো বা হয়তো অধিকাংশ শিকারই তখনও মারা পড়েনি। তখন শিকারী হোয়াইট-হান্টারকে ডেকে বললেন– 'বাবা! আমার গুলীতো লাগছে না, এবার লাইসেন্সের শিকারগুলো তুমিই একটু কষ্ট করে মেরে নিয়ে এসো।' হোয়াইট-হান্টার গিয়ে ওগুলো মেরে আনলেন, আর আফ্রিকা-ফেরৎ শিকারী ড্রইংরুমের দেয়ালে টাঙ্গালেন হাতির দাঁত, গণ্ডারের শিং আর সিংহের চামড়া। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়েছে। ব্যাপারটা হাসিরও; করুণও একদিক দিয়ে। সেদিন– গত বছর কি তার আগের বছর এক ভদ্রলোক গেছেন আফ্রিকা শিকারে। তার বহুদিনের আশা একটা সিংহ মারবেন। ভদ্রলোকটি বড়লোক নন– কষ্ট করে

টাকা জমিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে। তাই লাইসেন্সে একটা মাত্র সিংহ মারার অনুমতি পেয়েছিলেন তিনি, veldt দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার হোয়াইট-হান্টার দেখতে পেয়েছেন একটা সিংহ। গজ পঞ্চাশ দূরে একটা ঝোপের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘুমিয়ে আছে। হাত দিয়ে ইশারা করে ভদ্রলোককে দেখালেন– 'ঐ যে সিংহ।'

ভদ্রলোকের শহুরে চোখ সিংহ দেখে না। ঐ যে আগে বলেছি camouflage--সিংহের কেশর এমনিতেই একটা ঝোপের মত দেখায়--তায় আবার ঘুমিয়ে আছে আরেকটা ঝোপের নিচে। হোয়াইট হান্টারের পাকা চোখে দেখেছে সিংহকে; কিন্তু তাতে তো হবে না। দেখতে হবে এ ভদ্রলোককে কারণ মারবেন তো তিনি। হোয়াইট হান্টার তাকে সিংহটা দেখাবার খুব চেষ্টা করলেন--ফিসফিস করে বললেন--'ওই যে বা দিকের ওই বড় ঝোপটা দেখছেন ওর ডান পাশে যে চারাটা আছে, ওটার ঠিক ওপর দিয়ে দেখুন– দেখতে পাচ্ছেন?' 'কই না তো।'

যখন কোন মতেই ভদ্রলোককে দেখান গেল না সিংহটা তখন হোয়াইট- হান্টার এক বুদ্ধি করলেন। বললেন--'আচ্ছা এক কাজ করুন। ছোট ছোট চারা গাছটার সোজা ওপরে যে ডালটা দেখতে পাচ্ছেন না? ওর নিচ দিয়ে কি দেখছেন?' 'একটা ঝোপ।'

'আচ্ছা ডালটার আগাটা একটু বেঁকে গেছে দেখছেন?'

'দেখছি।'

'ওই বাঁকা জায়গাটার ঠিক দু'ইঞ্চি নিচে ঝোপটায় গুলী করুন। ভদ্রলোকটির চোখ সিংহ দেখতে না পেলেও দেখা গেল রায়ফেলের হাত বেশ ভাল। হোয়াইট-হান্টার আশা করছিলেন গুলীর সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা লাফিয়ে উঠবে– তাই রায়ফেল হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হ'ল না। গুলীর পর সব চুপচাপ। তখন তিনি শিকারী ভদ্রলোককে হাতের ইশারায় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে আস্তে আস্তে ঝোপের দিকে চললেন। পৌঁছে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন। শিকারী গিয়ে দেখলেন বেশ প্রমাণ সাইজের একটা সিংহ মরে পড়ে আছে। বেচারা যেমন পড়ে ছিল ওমনি আছে--একটু নড়তেও পারেনি।

ব্যাপারটা ভাবুন––শিকারী টাকা পয়সা খরচ করে আফ্রিকা গিয়ে নিজের হাতে গুলী করে সিংহ মেরে তার চামড়া নিয়ে দেশে ফিরে চলেছেন, অথচ তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়--'আপনি কখনও জঙ্গলে তাজা সিংহ দেখেছেন, তাহলে সত্যি বললে তাকে জবাব দিতে হয়– 'না!' করুণ নয়?

যা বলছিলাম। আফ্রিকায় কেমন করে শিকার করা হয় তার একটা আঁচ নিশ্চয় করতে পারছেন। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল– আফ্রিকা কেন, পৃথিবীর কোথাও কোন বন্যজন্তু আপনাকে গায়ে পড়ে আক্রমণ করতে আসবে না– যদি না আপনি কোন কারণ ঘটান। এর একটা কারণ আছে; সব জীব-জানোয়ারের মধ্যে আল্লাহ মানুষ সম্বন্ধে একটা ভয় দিয়ে দিয়েছেন। বললাম ভয়, এটা ঠিক ভয়ও নয়– একটা অদ্ভুত মনোভাব মানুষ সম্বন্ধে– তাকে এড়িয়ে চলার, হঠাৎ সামনা সামনি পড়ে গেলে পালিয়ে যাবার। একটা মানুষ খুব চেঁচামেচি করে একপাল হাতিকে তাড়িয়ে দিতে পারে, এবং দেয়ও। এই ভয় বা যাই বলুন একে, এ যদি না থাকত, তবে আফ্রিকার গভীর ভেতরে, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং অন্যান্য বন্য এলাকায় মানুষ বাস করতে পারত না।

তাই শিকারী যখন শিকারে যান তখন যতক্ষণ না তিনি কোন শিকারকে আঘাত করছেন ততক্ষণ তার কোন ভয়ের কারণ নেই। এই হ'ল সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হ'ল সেই বনে– যেখানে মানুষখেকো বাঘ বা সিংহ আছে। ব্যাস। সব উলট পালট হয়ে গেল। সে বনে আর আপনি শুধু শিকারী আর জন্তুটি শুধু শিকার নয়। সেখানে বাঘ বা সিংহও শিকারী, আপনিও শিকার, আর খাদ্য। আপনি চেষ্টা করছেন তাকে শিকার করার জন্য, আর সে চেষ্টা করছে আপনাকে শিকার করার জন্য। এখন যখন জানা আছে যে যাকে আপনি শিকার করার চেষ্টা করছেন সে আপনার চেয়ে অনেক ভাল শিকারী এবং তার শক্তি, চোখ, কান আর জঙ্গলকে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্থাৎ Jungle-craft ইত্যাদির সঙ্গে আপনার চোখ, কান ইত্যাদির কোন তুলনাই হয় না– তখন তফাৎটা লোমহর্ষক।

এই লোমহর্ষক তফাৎটার জন্য সুন্দরবন পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক শিকারভূমি। অবশ্য আরও কারণ আছে– তবে এটাই প্রধান। ফরেস্ট বিভাগের আন্দাজমতে, সুন্দরবনের যে অংশটা আমাদের ভাগে পড়েছে, শুধু তাতেই শ'পাঁচেক বাঘ আছে। সবগুলো বাঘই বেঙ্গল টাইগার, আর সবগুলোই মানুষখেকো। অবশ্য সুন্দরবনের প্রত্যেকটা বাঘই যে মানুষ খেয়েছে তা নয়– অনেক বাঘ আছে যেগুলো এখনও মানুষ খায়নি। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে সেগুলো মানুষখেকো নয়– কারণ হ'ল, সেগুলো এখনও সুযোগ পায়নি। সুযোগ পেলে আর দেরী করবে না অর্থাৎ Potential man-eater.

সুন্দরবনে আমি ও আমার সঙ্গীরা

মনে করুন– একজন শিকারী আফ্রিকার জঙ্গলে আর একজন শিকারী সুন্দরবনে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'জনের কাছেই রায়ফেল আর যথেষ্ট গুলী আছে। যিনি আফ্রিকাতে হারিয়ে গেছেন তার দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার খুব বেশী কারণ নেই। তিনি বিরক্ত না করলে কোন বন্যজন্তু তাকে আক্রমণ করবে না, ক্ষিদে পেলে তিনি হরিণ মেরে, আর পিপাসা পেলে নদীর খালের ঝর্ণার বা নিদেনপক্ষে ডোবার পানি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবেন। রাত্রে গাছে উঠে বা নিচে আগুন জ্বেলে ঘুম দিলে কেউ বিরক্ত করবে না। তারপর একদিক পানে চলতে চলতে আজ হোক কাল হোক কোন না কোন লোকালয়ে বা অন্ততঃ কোন নিগ্রো গ্রামে পৌঁছুতে পারবেন।

আর যিনি সুন্দরবনে হারিয়েছেন, তিনি যে মহূর্তে কোন বাঘের চোখে পড়বেন সেই মুহূর্ত থেকে বাঘ তার পেছনে লেগে যাবে পাকড়াও করার জন্য, আর তিনি যদি নিজেও বাঘের মতই শিকারী না হন, এবং তা হওয়ার সম্ভাবনা নেহায়েতই কম--তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে। এক মহূর্তের অসাবধানতাই যথেষ্ট। ক্ষিদে পেলে হরিণ মারতে পারেন অবশ্য কিন্তু পানি পাবেন না কোথাও। সব

পানি লোনা। দিনে দু'বার সমুদ্রের জোয়ার এসে সমস্ত বনটা ডুবিয়ে দেয়, কাজেই মাটিতে থাকা চলবে না। গাছগুলোর অধিকাংশই নানা রকম সাপে ভর্তি। আর এক দিক পানে চলার প্রশ্নই ওঠে না এই জন্য যে সমস্ত বনভূমিটা ছোটবড় নদী, আর খাল দিয়ে জালের মত করে ছাওয়া। সাঁতরে খাল নদী পার হবেন সে আশাও দুরাশা---বড় বড় কুমীর আর হাঙ্গর ভর্তি। কোথায় পৌঁছুবেন সে প্রশ্নও অবান্তর কারণ, সুন্দরবনের বন এলাকায় কোন মানুষের বাস নেই। বিপদে পড়লে কেউ যদি ইচ্ছা করেন দৌড়াবেন এমনকি তার পর্যন্ত উপায় নেই, অসংখ্য শুলায় বন ভর্তি--দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলতে হয়।

এই জন্য বলছিলাম সুন্দরবনের সাথে পৃথিবীর কোন বনের তুলনা হয় না। সুন্দরবনে হারিয়ে যাওয়া মানুষ যদি চব্বিশ ঘণ্টাও কোন রকম প্রাণ বাঁচাতে পারে তবে আমি অবাক হব। সুন্দরবন সত্যি পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বন।

অনেকের মনে ইতিমধ্যেই একটা প্রশ্ন জেগেছে ধরে নিতে পারি। সুন্দরবনের সব বাঘ মানুষখেকো হয় কেন? খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন---কিন্তু এর কোন জবাব নেই।

অনেক শিকারী বহু বিশেষজ্ঞ এর কারণ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনটাই সর্ববাদিসম্মতক্রমে গৃহীত হয়নি। এই কিছুদিন আগেও Statesman-এ একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল এই সম্বন্ধে। অনেক ফাঁক রয়ে গেছে– তেমন কিছুই প্রমাণ হয়নি।

আমিও যথেষ্ট ভেবেছি এ সম্বন্ধে---সত্যি আশ্চর্য! যে সব কারণে বাঘ, সিংহ মানুষখেকো হয় তার কোনটাই প্রযোজ্য নয় এই সুন্দরবনের ব্যাপারে। খুব বুড়ো হলে বা এমনভাবে পঙ্গু হলে, যাতে স্বাভাবিক শিকার ধরা সম্ভব নয়--বাঘ সিংহ মানুষ খেতে আরম্ভ করে। কারণ অন্যান্য জীবজন্তুর চেয়ে মানুষ শিকার করা অনেকটা সহজ, কারণ সব জীবজন্তুর আত্মরক্ষার জন্য দাঁত এবং নখ আছে যা মানুষের নেই, গায়ের শক্তিতেও মানুষ ওদের চেয়ে দুর্বল। এটা সুন্দরবন সম্বন্ধে খাটে না--কারণ তাহলে সব বাঘ মানুষখেকো হ'ত না। অনেক সময় খুব বেশী মানুষের সংস্পর্শে এলে মানুষের সম্বন্ধে ভয় ভেঙ্গে যায়। এটা খাটে না, কারণ এ বনে মানুষই নেই। অনেক সময় বোধ হয় একটা বাঘ বড় হওয়া পর্যন্ত মানুষ দেখেই না। কোন বনে স্বাভাবিক শিকার খুব কম হয়ে গেলে বা ফুরিয়ে গেলে ক্ষিদের জ্বালায় অনেক সময় মরিয়া হয়ে বাঘ মানুষখেকো হয়। তাও সম্ভব নয়, কারণ এখানে অগুনতি হরিণ আর শুয়োর আছে। তারপর কোন কোন সময় কোথাও মহামারী হয়ে বেশী লোক মারা গেলে যদি সৎকার করতে না পেরে লাশ জঙ্গলে ফেলে দেয়--তা খেয়েও বাঘ মানুষখেকো হয়ে দাঁড়ায় বলে কোন কোন শিকারী মনে করেন। এ প্রশ্নও অবান্তর--মানুষই নেই।

মোট কথা--এ প্রশ্নের জবাব অন্ততঃ আমার কাছে নেই। হয়ত রহস্যময় সুন্দরবনের এ ধাঁধা চিরদিন রহস্যময়ই রয়ে যাবে---।